প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রিয়ভাষী কবি

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

বন্ধুবরেষু

নিবেদন

খুব কাছের থেকে বাঙালি যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে, তখন এই বহুমুখী দিব্যপ্রতিভার মহিমা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। আজ বিশ বৎসরের ব্যবধানে রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং আধুনিক যুগে গ্যোটে ছাড়া আর কোনো প্রতিভা রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ এসেছে বলে মনে করি। এই গ্রন্থ তারই বিনীত প্রয়াস।

আমার দুই অনুজ শ্রীমান অশোককুমার ও শ্রীমান অমিতকুমার প্রেস-কাপি তৈরী করে দিয়েছেন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শেষস্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর

বলে যাব, 'তোমার ধূলির

তিলক পরেছি ভালে ;

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে,

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,

এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি'।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় তথা জীবনসাধনায় মনকে সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সমাজের যে-সব ক্ষেত্রে বুদ্ধির উদ্বোধন ও মূঢ়তার পরাভব লক্ষ্য করেছেন, সে-সব উদাহরণ তিনি সোৎসাহে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের বাংলাদেশে সার্বিক নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের চরিত্র-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি যে-সব কথা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ 'জাগরণ' বলতে মনে করতেন মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি, অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি। 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। এই মুক্তিকে স্বীকার করাতেই আমাদের গৌরব, অস্বীকারে মূঢ়তাই প্রকাশ পায়।

'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' আলোচনাপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের শুভকর প্রভাবের স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

ইংরেজের রাজ্যবিস্তার "উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।······পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবি ? কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস।···এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই

তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।...চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।" ['সাহিত্যের পথে']

ইয়োরোপকে আমাদের জীবনে কী ভাবে গ্রহণ করতে হবে, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না, মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। 'ন্যাশনাল' সাহিত্য ও জাতীয় আত্মাভিমান—দুই-ই তিনি বর্জন করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সর্বমানব-চিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে। এখানেই তার জীবনসাধনার সার্থকতা বলে' রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের অন্যতম প্রেরণাস্থল এই অনুভূতি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উপরি-ধৃত প্রবন্ধাংশ রচিত হয়।

তার বত্রিশ বছর আগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে ['ধর্ম'] আমাদের দেশের ব্রহ্মসাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকাল-সঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদেব মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানব-সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা

আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।" [ফাল্গুন, ১৩১০]

শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবাত্মাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে জ্ঞানে ও ভক্তিতে পেয়েছিলেন, তার বত্রিশ বছর পরে, পঞ্চমবার ইয়োরোপ ভ্রমণের পরে পুনশ্চ-পত্রপুট-মানুষের ধর্ম-'Religion of Man'-এর যুগে সর্বজনীন মানবকে লাভ করেছেন মনন ও বুদ্ধির মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার ইয়োরোপ-ভ্রমণে যান ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। 'পথের সঞ্চয়' সে ভ্রমণের ফল। চতুর্থবার ইয়োরোপ-ভ্রমণের (১৯২৬) ফল 'পথে ও পথের প্রান্তে'। রবীন্দ্রনাথের মনের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এই দুটি ভ্রমণ। ইয়োরোপ ভ্রমণকে তিনি তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেছেন। 'পথের সঞ্চয়ে' কবি বলেছেন, "বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।" (যাত্রার পূর্বপত্র)

পাশ্চাত্ত্য জীবনের আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ 'পথের সঞ্চয়ে' জঙ্গমশক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন। এই জঙ্গমশক্তি ও গতিবাদ পাশ্চাত্ত্যের তীব্র গভীর জীবনপিপাসার পরিচয়স্থল। প্রাচ্যের গতিতত্ত্ব এর বিপরীত। ভারতবর্ষের গতি নির্বাণের পথে, জীবন তার কাছে মায়া। আর পাশ্চাত্ত্যের গতি প্রবল প্রাণশক্তি বিকাশের ও সম্ভোগের পথে, জীবন তার কাছে সত্য। 'বলাকা' কাব্যে এই গতিবাদ বাণীরূপ লাভ করেছে। ইয়োরোপ সম্পর্কে যে-বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ', 'ধর্ম' প্রমুখ প্রবন্ধ-পুস্তকে দেখা যায়, তা অপসৃত হয়ে যাচ্ছে এবং নোতুন জীবনদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, 'বলাকা' কাব্যে তার প্রমাণ পাই। ইয়োরোপের জঙ্গম জীবন তথা মানুষকে দেখে রবীন্দ্রনাথ সনাতন আর্যধর্মের বেড়া ভেঙে মানবত্বাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন, তার ইশারা এখানে পাই।

এরপর চতুর্থবার ইয়োরোপে ভ্রমণ (১৯২৬)। 'পথে ও পথের প্রান্তে' এই ভ্রমণের ও পরবর্তী ভ্রমণের ফসল। পঞ্চম ও শেষবার ইয়োরোপ ভ্রমণের (১৯৩০) ফলে আমরা পেয়েছি 'রাশিয়ার চিঠি', 'পুনশ্চ', 'Religion of Man', 'মানুষের ধর্ম'। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইসব গ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধ পরস্পর-সংযুক্ত। আর এই বিশ্বমৈত্রীবোধের উৎস সন্ধান করলে আমরা বাংলাদেশের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কেন্দ্রে উপনীত হই।

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐক্যের উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। তাঁরাই মহাপুরুষ যাঁরা অনৈক্য ও বিচ্ছেদ, সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তি দেন। বুদ্ধদেব থেকে রামমোহন পর্যন্ত মহামানবের ধারা পর্যালোচনা করে তিনি এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, "বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগ বিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।" ('ভারতপথিক রামমোহন')

এই মৈত্রীসাধনায় যে-সব মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মুক্তিদাতা মনে করেছিলেন। চৈতন্যদেব, কবীর, দাদূ, নানক, তুকারাম, প্রমুখ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার আলোচনা করেছেন এবং ভারতবর্ষের মনের মুক্তিদাতা বলে তাঁদের অভিহিত করেছেন।

আধুনিক কালের সূচনায় ঐক্যবোধ তথা বিশ্বমৈত্রীবোধ যাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি রামমোহন রায়। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-পথিক' বলে উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁকে বিশ্বপথিক রূপেও দেখেছেন। আমাদের দেশে আচার, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের বহুবিধ জটিলতাজালে আবদ্ধ মন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, সতেরো-আঠারো শতকে আমাদের ধর্মের নিঃসাড় প্রাণহীন অবস্থা দেখা গিয়েছিল, আমরা—ভারতীয়েরা নিত্যধর্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধা করেছিলাম। এই অবস্থায় রামমোহন রায় এসেছিলেন। তিনি বেদ-উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করলেন। ধর্মপ্রবক্তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের

মধ্যে ঐক্যবাণী উদ্ধার করলেন এবং পাশ্চাত্য জগতের দিকে সহযোগিতার উদার নিমন্ত্রণ পাঠালেন। এইজন্যই রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের মুক্তিদাতা। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-পথিক রামমোহন')

ইয়োরোপ থেকে মানবমুক্তিবাণী ও বিশ্বমৈত্রী-মন্ত্রটি উনিশ শতকের নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালি গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই কালান্তর লগ্নে। রামমোহনের পর মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মুক্তি-সাধনায় অবশ্যস্মর্তব্য। নোতুন মূল্যবোধকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা ও পুরনো মূল্যবোধের বিসর্জনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনাকে সংহত রূপদান করেছিলেন। উনিশ শতকের বেশির ভাগ বাঙালি মহাপুরুষ ইয়োরোপের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র-নাথ, অক্ষয়কুমার, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র—পশ্চিম-জগতের সঙ্গে এই শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের মিলনসাধনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসেবায় যতই বাঙালি সমাজ অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিমের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং বাঙালি মনকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংযোগ সম্পর্ককে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে না রেখে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করলেন এবং বললেন,

> "তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি, য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল ; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়-সংগত অধিকারকে।" (কালান্তর)

॥ ৩ ॥

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন [দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ-সূচনায় 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি], আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকরূপে ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে জীবনে পেতে চেয়েছিলেন [দ্রষ্টব্য—'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালা]। তখন তিনি মনে

করেছিলেন, চিরপুরাতন ভারতবর্ষের উপাসনায় আমাদের মুক্তি। 'স্বদেশ' প্রবন্ধ-গ্রন্থে (১৯০৮) তিনি বলেছিলেন, "অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব" [১৩০৯, 'নববর্ষ', 'স্বদেশ']। তার পূর্বেই 'নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯০১) বলেছিলেন,

'দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র অশোক-মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র দাও সে জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু তরণ শংকা-হরণ দাও সে জীবন নব।'

শতাব্দীর সূচনায় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যেদিন স্থাপনা করেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল ছাত্রদের প্রাচীন ভারতের আশ্রমের ধাঁচে জীবন-যাত্রা ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ঔপনিষদিক ও বৈদিক সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিকেরা নিযুক্ত হবে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিলাষ। পরবর্তী কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মন কোন্ পথে চালিত হয়েছিল, তা জানা যায় 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালা-পাঠে। তপোবনের আদর্শচিত্র রবীন্দ্রনাথ যতটা না ইতিহাসে তদপেক্ষা বেশি রচনা করেছিলেন তাঁর ধ্যানের মধ্যে। কিন্তু ১৯০১ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ: এই বিশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের এইসব ধারণায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্থানে ১৯২০তে স্থাপিত হ'ল বিশ্বভারতী—তা বাঙালির নয়, হিন্দুর নয়, তপোবনের নয়, তা বিশ্বের—তা আধুনিক কালের। বিশ্ব-ভারতীতে বিশ্ব এসে একত্র নীড় বাঁধলো—রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটল।

রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বার ইয়োরোপ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্রমণকালে তিনি কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক মাত্র, পরিণত জীবনের দায়িত্বজ্ঞান ও চিন্তা-গভীরতা তখনো রবীন্দ্রনাথে বর্তায় নি। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (প্রথম খণ্ড, ১৮৯১ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৩)—এ দুটি গ্রন্থে প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য, উৎরুমনা ও অস্থিরতাই বড় কথা। কোনো গভীর কথা স্থান পায় নি।

তৃতীয়বার ইয়োরোপভ্রমণের ফল 'পথের সঞ্চয়' (১৯১২)। 'য়ুরোপের অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি' এই যাত্রায় কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'স্বদেশ' প্রবন্ধ-গ্রন্থে চল্লিশ বৎসর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপকে জড়বাদী বলেছিলেন, আজ বাহান্ন বৎসর বয়সে ইয়োরোপের আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার যৌবনচাঞ্চল্যে, আত্মত্যাগেচ্ছায়, প্রাচুর্যে ও বিপদ্-বরণে। ইয়োরোপের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি এই প্রশ্নবাণে নিক্ষেপ করেছেন, "আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোন যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটি লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে, আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।" [যাত্রার পূর্বপত্র, 'পথের সঞ্চয়']

ইয়োরোপীয়দের জীবনচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব।······যে-শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে। এই-যে উদ্যত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর।" (খেলা ও কাজ, তদেব)

বিশ্বমানবতাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই। ব্রহ্মোপলব্ধি যা কল্পনাসর্বস্বতার নয়, নিতান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনের আবশ্যকতা তিনি ঐ সময়েই উপলব্ধি করেছেন। কেম্‌ব্রিজের কলেজ-ভবনে অধ্যাপক লোয়েস্ ডিকিন্সন ও অধ্যাপক রাসেলের সাহচর্যে তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। কেম্‌ব্রিজের সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানে নিশীথে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর সাহচর্যে ও আলাপে মানবতার বিচিত্র ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন: "মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে

প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমরোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠে কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম। [ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ, তদেব]

এরপর দেশে ফিরে কবি লিখলেন 'বলাকা' (১৯১৬)। এই কাব্যে পাশ্চাত্ত্য জীবনের অদম্য শক্তিকে বরণ করে নেবার উন্মুখতার পরিচয় পাই। সত্যের creative পরিবর্তনশীলতায় কবি এই প্রথম আস্থা স্থাপন করলেন বুঝলেন—এক সত্যের প্রেরণা নিঃশেষিত হয়ে গেলে অপর নবীন সত্যকে জীবনে বরণ করে নিতে হয়, উপলব্ধি করলেন—'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি', সন্ধান করলেন জীবনের তথা মানবতার ধ্রুবাদর্শকে। ইয়োরোপের গতিশক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্যের যে প্রশংসা 'পথের সঞ্চয়ে' বিধৃত হয়েছে, তাই কবিকে 'বলাকা' কাব্যরচনায় প্রেরণা দিয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই সময়েই সবুজপত্র-পর্বের সূচনা। 'ঘরে-বাইরে' (উপন্যাস), 'স্ত্রীর পত্র', 'গল্পসপ্তক' (গল্প), 'বলাকা' (কাব্য), 'ফাল্গুনী' (নাটক), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (প্রবন্ধ)—সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটল এবং তার বাইরের তাগিদ হয়ত প্রমথ চৌধুরীর অনুরোধ, কিন্তু কবির অন্তরে তার প্রেরণা ছিলই। ইয়োরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার এই পরিবর্তনের পটভূমি, চলতি গদ্যরীতি এর প্রকাশবাহন। রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। বস্তুতঃ এ তাঁর কেবল ঘরে-ফেরা নয়, মানুষের দিকে ফেরা। রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে অধিকতর বাস্তব-সচেতন, আধুনিক যুগের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে রূপ দিলেন, জীবনকে আরো গভীরভাবে গ্রহণ করলেন—জীবনের রুক্ষ, কঠোর, দৈন্যপীড়িত ছবির সম্মুখীন হলেন।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ইয়োরোপ ভ্রমণে যান ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে; পঞ্চম বা শেষবার ভ্রমণ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্রগুচ্ছে (প্রকাশঃ ১৯৩৮) এই দুই ভ্রমণের কিছু কিছু পরিচয় রয়েছে। ইয়োরোপকে ভাল

লাগছে, আমেরিকায় গিয়ে মনটা চাপা পড়ে, ইয়োরোপে তা মুক্তি পায়—এই ধরণের মন্তব্য এই পত্রগুচ্ছে প্রায়ই পাওয়া যায়। ১৮ই অগস্ট, ১৯৩০ তারিখাঙ্কিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবসংঘ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সজীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে ঠিক সুর বাজে নি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণ-শক্তির উদ্‌বোধন ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস।"

বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ উপর্যুক্ত রচনানিচয়ে পাওয়া যায়। জাগরণের অর্থ যদি এই হয় যে ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর—জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই বেড়া ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর উপনিষদবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্ম সমাজ নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা—সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁচেছে—রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও ছবিতে যেরকম দেশকালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মননপন্থী ও অমূর্তপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা মানবচিন্তার ক্ষেত্রেও সেরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন।

পঞ্চমবার ইয়োরোপ ভ্রমণের পর কবি দেশে ফিরলেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। 'রাশিয়ার চিঠি' (ভ্রমণপত্রাবলি), কালের যাত্রা (নাটিকা), পুনশ্চ (গদ্য-কাব্য), Religion of Man (অক্সফোর্ড হিবার্ট-বক্তৃতা), মানুষের ধর্ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃতা)।

উনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণের ফলে বাঙালি বিশ্বপথে আত্মাবিষ্কারে বেরিয়েছিল। সে-সন্ধান সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে। তিনি বাঙালিকে বিশ্বপথিক-ধর্মে তথা মানবধর্মে পূর্ণ দীক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত উপর্যুক্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। যুগের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ সংহতরূপ দান করেছেন।

অক্সফোর্ড হিবার্ট-বক্তৃতায় মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত ও বাংলার বাউলদের মানবসাধনা তথা আত্মান্বেষণ-কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্বকে আপন জীবনের প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। Supreme Person বা মহামানবকে তিনি মানবসংসারেই পেতে চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞানসত্যের আলোকে তিনি মানবধর্মের বিশুদ্ধ রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'মানুষের ধর্ম' ও 'পুনশ্চ' কাব্যেও একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি। রজ্জব, কবীর, দাদূ, রামানন্দ, নাভা, রবিদাস, নানক ও বাংলার বাউলদের জীবনসাধনাকে 'পুনশ্চে' তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে অন্ত্যজদের মধ্যে মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও অন্ধতাকে, সমালোচনা করেছেন সংকীর্ণতা ও আচারানুগত্যকে 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটিকায় শূদ্রদের কবি যে সন্ধান দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি মানবদেবতাকে শূদ্রের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হার মানার পর শূদ্র হাত লাগাতেই রথ চলতে লাগল। এই সংকেত-কাহিনীতে মানবধর্মের জয়ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'মানবপুত্র' ও 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটিতে বৃহৎ মানবমহিমাকে কাব্যরূপ দান করেছেন।

মানবসত্যের সঙ্গে সংসারের সত্যের বিরোধ বাধে, এই বিরোধে মানবসত্যের পক্ষাবলম্বন যে করে, তারই জীবন সার্থক, এ-কথা 'মানুষের ধর্মে' কবি ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথাতেই বলি,

"রজ্জব বলেছেন—

> সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।
> জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলেছেন, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, একথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা

সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। তবু সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।"

সর্বজনীন মানবতাবোধের পরমতীর্থে উপনীত হওয়াই আজকের মানুষের সাধনা; রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের এ-ই পরম সত্যোপলব্ধি। এই সত্যকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালার ভূমিকায়—

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানুষকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে, 'এষ দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।"

এই সর্বকালীন মানবকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মগ্রন্থে বা আচারানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেন নি, একে তিনি অন্ত্যজ মানুষের হৃদয়ের অমেয় ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবমহিমার বন্দনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, মানবাত্মার সর্বশেষ মন্ত্রটিও উচ্চারণ করেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হ'ল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে। (পত্রপুট)

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম এই পরম সত্যোপলব্ধির দিব্যবিভায় প্রোজ্জ্বল।

উনিশ শতকের গীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

বাংলা কাব্যের হাজার বছরের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তা রবীন্দ্রনাথেই থেমে যায় নি, তারপরও এগিয়ে চলেছে। তথাপি শতাব্দীর অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ আরো বহু বছর আমাদের জীবনে-সাহিত্যে-শিল্পে কেন্দ্রীয় প্রভাবশক্তিরূপে বিরাজ করবেন, একথাও স্বীকার্য।

এই অমিতশক্তি কবিপ্রতিভার উদ্ভব কেমন করে হ'ল, কোন্ মানস পরিবেশে তা বেড়ে উঠেছিল, তা কি অমূল-তরু না দেশের চিত্তভূমিতে তার উৎপত্তি: এসব কথা জানতে স্বভাবতই রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই কৌতূহল হয়। এই কবিপ্রতিভার গঙ্গোত্রী থেকে মোহনা পর্যন্ত পথ-পরিক্রমার শেষে তাঁর কথাতেই বলতে ইচ্ছা করে: 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!'

এখানে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সার্বিক নবজাগরণের পটভূমিতে কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের কাব্যগত মূল্য নিরূপণের পূর্বে তাঁর দুটি উক্তি স্মরণ করা যাক। দুটি উক্তিই উনিশ শতকের বাংলা দেশের রেনেসাঁস্ সম্পর্কে। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য কবির জন্ম হয়েছিলো ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

কবি বলেছেন: "যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি ·····সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামল পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করি নি।"

কবি নবীন জগতের মানুষ; প্রাণশক্তির উপাসক। তাই তাঁর পক্ষে সহজেই চিরাগত সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণকে এই সংস্কারমুক্ত নবীন দৃষ্টিতেই

রেখেছিলেন, বলেছিলেন, "যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে একটি কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস স্বাভাবিক নয়। তার মানে যদি এই হয় যে, এ সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না, এর অঙ্কুর উঠলেও শিকড়সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।......আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।...... বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানাপথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়নকাঠি একদিন সমুদ্র পার হয়ে বাংলা ভাষাকে স্পর্শ করল। বন্দিনী যেমন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এমন ঘটে নি। তারপর থেকে বাঙালির ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষণিকা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল।"

['বাংলা কাব্য পরিচয়', ভূমিকা]

এই জাগরণের সার্থক পরিচয়স্থল উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য। রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলো এই পটভূমিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার শ্রীসজনীকান্ত দাস-কৃত তালিকা এখানে উদ্ধার করছি (দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃঃ ১০৪)—

১। 'অভিলাষ'—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর।

২। 'হিন্দুমেলার উপহার'—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় স্বনামে ১৮৭৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী।

৩। 'প্রকৃতির খেদ'—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৫ জুন।

৪। 'জল জল চিতা'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে ১৮৭৫, ৩০শে নভেম্বর।

৫। 'প্রলাপ' (১, ২, ৩)—'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'এ ১৮৭৬, ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে।

৬। 'দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর'—১৮৭৭ সনে হিন্দুমেলায় পঠিত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ১৮৮২।

৭। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা'—'জাতীয় সঙ্গীত' প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণে ১৮৭৮, ৩০শে অগস্ট।

৮। 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত'—ঐ ঐ ঐ ১৮৭৮, ৩০শে অগস্ট।

৯। 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ।

এ ছাড়া 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যানুবাদ এবং 'শৈশব সংগীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অন্তর্ভুক্ত (১৮৭৭ খ্রীঃ জুলাই, ১২৮৪ শ্রাবণ থেকে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত) কবিতা ও গান কিশোর কবির প্রথম সাহিত্যসম্ভার বলে গণ্য হতে পারে।

উপর্যুক্ত নয়টি কবিতাই কিশোর রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে সতেরো বৎসর বয়সের রচনা। প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ এগুলির মধ্যে দেখা যায় না, একথা স্বীকার করতেই হয়। মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয় চৌধুরীর নিছক অনুকরণ ও কালিদাস-শেক্‌স্‌পীয়ারের বিশ্বস্ত অনুবাদরূপেই এগুলিকে গণ্য করতে হয়। দিব্য কাব্যপ্রেরণার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি লক্ষ্য করা গেল 'অবসাদ' কবিতায় ('বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা আঃ ১৮৭৪ খ্রীঃ)। কবিতার শেষে লেখা আছে 'বালক' রচিত, আর সূচীপত্রে লেখা আছে—রচনাকার "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাল্যকালের লেখা)।" এটি আবিষ্কারের গৌরব দাবি করতে পারেন শ্রীসজনীকান্ত দাস (দ্রঃ "রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য", পৃঃ ১০৭)।

প্রতিভার প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই 'অবসাদ' কবিতায় আছে। অশেষ মূল্যবান দুর্লভ কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি—সন্ধ্যাসংগীত-মানসী-চিত্রার কবিকে এখানে রসিক পাঠক আবিষ্কার করে বিস্মিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, সমস্ত মনে বলে ওঠে—পেয়েছি, গঙ্গোত্রীকে পেয়েছি, উষার প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

প্রাক্‌সন্ধ্যাসংগীত-পর্বের এই কবিতাটি নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজমান। সম্পূর্ণ কবিতাটি এই :

করুণাময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন
ঢাল' এ হৃদয়মাঝে অনন্ত অনলময় বল !
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন ;
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল !
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে ;
এস দেবি, এস, মোরে
রাখ এ মূর্ছার ঘোরে ;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে !
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে অনন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী !
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত !
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান !
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান !
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বি ভরে গঠিব সোপান,

তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোত্তম, অবসন্ন, দুর্বল পথিকে
কর গো জীবন দান তোমার ও অমৃত নিষেকে!

বীণাপাণির শরণার্থীর কণ্ঠস্বরে 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) কবিতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় যে দিব্য প্রেরণা ও অপার বেদনার কথা বলা হয়েছে, এখানে সে প্রেরণা ও বেদনার প্রথম ইশারা পাই। 'কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম'—এই গর্বিত ঘোষণা একমাত্র প্রতিভারই সাজে, পরবর্তী ষাট বছরের কাব্যসাধনায় এই ঘোষণা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। জীবনস্মৃতির দুটি অধ্যায়ে ('প্রত্যাবর্তন' ও 'সাহিত্যের সংগী') মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণান্তে প্রত্যাবৃত্ত বারো বছরের বালকের মনোভাব রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবল বিরাগ ও কবিতায় মুক্তি অন্বেষণ তখন বালকের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। দুটি উক্তি 'অবসাদ' প্রসংগে স্মরণযোগ্য। 'প্রত্যাবর্তন' অধ্যায়ে কবি বলছেন: "আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সংগে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সংগে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" তাই বারবারই বেঙ্গল একাডেমী ও সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে নানাছলে পলায়ন।

আর 'সাহিত্যের সংগী' অধ্যায়ে এই সময়ের (১৮৭৩-এর মাঝামাঝি) বর্ণনা: "হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না।...বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।...উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।"

এই ধিক্কার ও অবসাদ, লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্য, অশান্তি ও আক্ষেপের মধ্যে প্রতিভার ব্যাকুল প্রার্থনা :

দয়াময়ি বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও জাগাও দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন।...
অজ্ঞাত পৃথিবী তলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।

কাব্যসরস্বতী তাঁর ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন—সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য তার প্রমাণ।

॥ ২ ॥

উনিশ শতকের গীতিকবিতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাকে স্থাপিত করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্র-প্রতিভা অমূলতরু নয়, তা আপনাতে আপনি বিকশিত হয় নি, সমকালীন কাব্যভূমি থেকেই জীবনরস আহরণ করেছিল।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্তক কাব্যের দুটি বিশিষ্ট রীতিতে দু পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। একদিকে মধুসূদন দত্ত, তাঁর বাহন ক্লাসিক মহাকাব্য, আরেকদিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী, তাঁর বাহন রোমান্টিক গীতিকাব্য। বাংলা কাব্য সেদিন এই দুই পথের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল—কোন্ পথে সে যাবে? এই প্রশ্নের সার্থক উত্তর পাই রবীন্দ্র-কাব্যে।

সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর দান সহজসাধ্য ছিল না। কেননা পথ নানা জটিল জালে আকীর্ণ ছিল। বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব বাংলা কাব্যেতিহাসে কখনই দেখা যায় নি। ইংরেজি কাব্যের পথানুসরণে বাংলা কাব্যে একটানা ক্লাসিক পর্বের অন্তে রোমান্টিক পর্ব আসে নি। এই যুগে মহাকাব্য, কাহিনীকাব্য এবং রোমান্টিক গীতিকাব্য একই সময়ে লিখিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, যিনি মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত দীর্ঘ কাহিনীকাব্য লিখেছেন, তিনিও রোমান্টিক কবিকল্পনাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি, বরং গীতি-প্রবণতা তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ যুগের কবিরা সজ্ঞানে

সচেতনভাবে ক্লাসিক কাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার ধ্বনি হাওয়া আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি। সুতরাং বাংলা কাব্যের কোন নির্দিষ্ট বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব ছিল না।

এই জটিল আবর্তের মধ্যে কিশোর রবীন্দ্রনাথও পড়েছিলেন। তখনকার প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ কবিদের প্রভাব তাঁর উপরও পড়েছিল। 'বনফুল' (রচনা: ১৮৭৬, প্রকাশ: ১৮৮০) থেকে 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩)—এই আট বছর কিশোর কবি পথসন্ধান করেছেন। এই সময়ে (১৮৭৬-৮৩) রচিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা:

১৮৭৮	কবিকাহিনী	(কাহিনীকাব্য)
১৮৮০	বনফুল	(ঐ)
১৮৮১	ভগ্নহৃদয়	(ঐ)
	বাল্মীকি-প্রতিভা	(গীতিনাট্য)
	রুদ্রচণ্ড	(নাটিকা)
	য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	(ভ্রমণ)
১৮৮২	সন্ধ্যাসংগীত	(গীতিকাব্য)
	কালমৃগয়া	(গীতিনাট্য)
১৮৮৩	বৌঠাকুরাণীর হাট	(উপন্যাস)
১৮৮৩	বিবিধ প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)
	প্রভাতসংগীত	(গীতিকাব্য)

এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বাহন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন: কাহিনী-কাব্য, নাটক, ও গীতিকবিতা। বনফুল ও কবিকাহিনীর পরে কাহিনীকাব্য রচনা ছেড়ে দেন, বাকি রইল নাটক ও গীতিকবিতা। বাল্মীকি-প্রতিভাকে বাদ দিলে দেখা যায়, রুদ্রচণ্ড নামক ট্রাজেডি দিয়ে তিনি নাট্যরচনা শুরু করেন; প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা থেকে শুরু করে নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় নাট্যরীতিতে উপনীত হন।

গীতিকবিতাই রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন, একথা অনস্বীকার্য। কাহিনী-কাব্য ও ট্রাজেডি রবীন্দ্র-প্রতিভার অনুকূল নয়, একথাও অস্বীকার করা যায় না। তবে তিনি কেন ঐ দুই জাতীয় রচনা দিয়েই সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে সমকালের সাহিত্য-পরিবেশটি স্মর্তব্য। ঐ সময়ে কাব্যজগতে রাজত্ব করছিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল। "মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনা-প্রধান বহির্মুখী মহাকাব্য; বিহারীলালের ঘটনাবিরল গীতিপ্রধান অন্তর্মুখী দীর্ঘকাব্য; এ দুইয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কাহিনীকাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য মাইকেল-হেমচন্দ্র অপেক্ষা বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবেই তাঁহার কাহিনীকাব্যে অনেক বেশী।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর')। বনফুল ও কবি-কাহিনী—রবীন্দ্রনাথের এই দুই কাহিনীকাব্য তাই সেদিনের প্রচলিত সাহিত্যপ্রথার অনুসৃতি মাত্র।

এরপর ভগ্নহৃদয়। "নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাব্যীয়: বহির্লক্ষণ নাটকের, অন্তর্লক্ষণ কাব্যের; বেশ বোঝা যায়, দুই শ্রেণীর রচনাই কবির মনকে টানিতেছে; আবার কবিকাহিনী-বনফুল-রচয়িতার কলমও একেবারে বিরতি লাভ করে নাই, সেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়া গিয়াছে। কাহিনীকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্র প্রভাবে ভগ্নহৃদয়ের সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্রকাব্যে তেমাথার মোড়; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক।" (তদেব)

বনফুল ও কবিকাহিনীতে "গল্পের ক্ষীণ সূত্রে লিরিকের মালা গাঁথা হইয়াছে, গল্প গৌণ হইয়া পড়িয়া লিরিক মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালে এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো-মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে।" (তদেব)। বনফুল, কবিকাহিনী, ও ভগ্নহৃদয়—এই তিন কাহিনীকাব্য কবির প্রচলিত প্রথানুবর্তন ও আপন স্বভাবের অনুকূল পথাবিষ্কার-প্রয়াসের প্রামাণ্য দলিল।

এখন কাহিনীকাব্য বিদায় গ্রহণ করেছে, কিন্তু নাটক গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্তিতে বাধা দিচ্ছে। কবির লিরিক ও নাটকের প্রকাশ-তালিকা এখানে দিলাম:

সন্ধ্যাসংগীত	১৮৮২	প্রকৃতির প্রতিশোধ	১৮৮৪
প্রভাতসংগীত	১৮৮৩	নলিনী	১৮৮৪
শৈশবসংগীত	১৮৮৪	কড়ি ও কোমল	১৮৮৬
ছবি ও গান	১৮৮৪	রাজা ও রাণী	১৮৮৯

বিসর্জন	১৮৯০	মানসী	১৮৯০

এই তালিকা দেখলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিকবিতা সমান্তরাল ভাবে চলেছে, কিন্তু গীতিকবিতা অপেক্ষা নাটকের পরিণতি ও পূর্ণতা আগেই ঘটেছে। রাজা ও রাণী ও বিসর্জন—এই দুই ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি-রচনায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল; নিখুঁত পরিপূর্ণ ফল। এর পর রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হয়েছে, ট্রাজেডি রচনায় আর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না; পরবর্তী কালে রচিত ট্রাজেডিতে অন্য গুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

কবি তখন ট্রাজেডি ছেড়ে গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি অত শীঘ্র ও অত সহজে পরিণতিতে উপনীত হন নি।

ভগ্নহৃদয়ের দ্বিধা-বিভক্ত পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এবার কোন্ পথে? এর পরই পাই শৈশবসংগীত (রচনা ১৮৭৭-৮০; প্রকাশ ১৮৮৪)। গীতিকবিতার বিলম্বিত পরিণতির কারণ শৈশবসংগীতে পাওয়া যায়।

"শৈশবসংগীতে অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু কি? 'ফুলবালা', 'দিক্‌বালা', 'অপ্সরা প্রেম', 'কামিনী ফুল', 'গোলাপবালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী' ইত্যাদি। এসব বিষয় কবিরা তখনই গ্রহণ করিয়া থাকেন যখন জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে নাই।......এই জীবন-পরিচয়ের ঐকান্তিক অভাব শৈশবসংগীতে।......এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত তাহার কারণ জীবন-পরিচয়ের জন্য কবিকে নিজের অভিজ্ঞতার জগতে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। নাটকের গল্পাংশেই তিনি তাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন।......শৈশবসংগীতের প্রধান গুণ জীবনপরিচয় নহে, কবিতার গীতিসম্পদ।" (তদেব)

সুখের বিষয় এই যে, গীতিকবিতার পরীক্ষা তাঁকে দীর্ঘকাল করতে হয় নি। শৈশবসংগীত রচনার পরেই সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রচিত। সন্ধ্যাসংগীত রচনার পর কবির আর সন্দেহ ছিল না যে, গীতিকবিতাই তাঁর যোগ্য ও সত্য বাহন। সেকারণেই সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য এত বেশি। এর পর প্রভাতসংগীত। কবিতা মগ্ন করার দিন শেষ হল, কিশোর কবিযশঃপ্রার্থী এইবার পরিণত কবি হলেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের তিনটি মূল তত্ত্ব প্রকাশ লাভ করেছে—(ক) আত্ম-সচেতনতা: 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'; (খ) সেই জাগ্রত প্রাণের সংগে পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব: 'ওরে চারিদিকে মোর, একি কারাগার ঘোর'; এই বদ্ধ কারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার সংকল্প: 'আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা'; (গ) এই প্রতিষ্ঠার অর্থ জীবনে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ: 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া' জীবনকে বিকশিত করাই এর উদ্দেশ্য। মানসী কাব্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা আপন শক্তিতে ও প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো, একটা স্পষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও সাধনার পরিচয় কবি দিলেন। প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বে হেমচন্দ্র-বিহারীলালের প্রভাব কিছু কিছু ছিল, মানসীতে এসে রবীন্দ্রনাথ সকল বহিঃপ্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, আপন চিত্তদীপ জ্বালিয়ে তারই আলোকে নোতুন পথে যাত্রা করলেন।

॥ ৩ ॥

কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের প্রভাবই বেশি। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কবিধর্ম এমনই বিপরীত যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ভুলেও মাইকেলের দিকে আকৃষ্ট হন নি। মাত্র একটি ক্ষেত্রে—'বনফুল' কাহিনীকাব্যের তৃতীয় সর্গে কমলা-নীরজার কথোপকথন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা সংবাদের অনুরূপ। এ ছাড়া আর কোন প্রভাব নেই। আর মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে ও রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদটাই বড়, মিল গৌণ। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে নবীনচন্দ্রের প্রভাব নেই। কারণ নবীনচন্দ্রের বহুখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনার পরে। হেমচন্দ্রের প্রভাব শৈশবসংগীতেই শেষ। সন্ধ্যাসংগীতে কবি এইসব বহিঃ-প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন ও নিজস্ব পথ আবিষ্কার করেছেন।

হেমচন্দ্রের প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের 'অভিলাষ' ও 'হিন্দু মেলায় উপহার' কবিতা দুইটিতে হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রথমটি নীতিমূলক, দ্বিতীয়টি দেশপ্রীতিমূলক কবিতা। হেমচন্দ্রীয় রূপকচিত্রণ ও নীতি-আরোপ-প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ', 'কালচক্র', 'ভারতসংগীত' (কবিতাবলী), 'কি

হবে কাঁদিয়া' (চিত্তবিকাশ), 'মন্ত্রসাধন' (বিবিধ কবিতা) প্রভৃতি কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই দুটি কবিতার সাদৃশ্য আছে।

শৈশবসংগীতের কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আরো স্পষ্ট। যেমন, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণিমানিশি বর্ণনা :

আজি পূরণিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস নয়নে শশী—
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন সে ভাবিছে। [শৈশব সংগীত]

তুলনীয় হেমচন্দ্রের অনুরূপ বর্ণনা :

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী জল ['যমুনাতটে' কবিতাবলী]

প্রকৃতিবর্ণনায় হেমচন্দ্রের স্বকীয় দৃষ্টিভংগী ছিল—মানবের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কবি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাক্-বিহারীলাল-পর্বে এই প্রকৃতিবোধ প্রশংসাই। প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে হেমচন্দ্র ব্যথিত মনের সান্ত্বনা অন্বেষণ করেছেন :

কে আছে এ ভূমণ্ডলে যখন পরাণ
জীবনপিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।
['যমুনাতটে', কবিতাবলী, ১৮৭০]

কিশোর রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কাব্য-ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন :

কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে,
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা সুখের তরে দিবানিশি তার
হৃদয়ের একদিক শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস ?

['কবিকাহিনী' (১৮৭৮) তৃতীয় সর্গ]

প্রকৃতিবর্ণনায় কিশোর কবি আর এক জনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কবির অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রূপক কাব্যটিতে যে স্বপ্নলোক নির্মাণ করেছিলেন, তার সৌন্দর্যে অনুজ কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বপ্নপ্রয়াণের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। তার পরিচয় পাই পাতাল বর্ণনায়—

গম্ভীর পাতাল ! যথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ॥

[স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫), পঞ্চম সর্গ]

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের শ্মশান বর্ণনা—

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ।
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন।
সরসর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়।

[বনফুল (১৮৮০), সপ্তম সর্গ]

বর্ণনাভঙ্গী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের অনুসৃতি এখানে অতি স্পষ্ট।

এহ বাহ্য, কেননা এইসব প্রভাব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের নিজ স্বীকৃতি ও রচনায় সাক্ষ্য অনুসারে একথা বলা যায় বিহারী-

লালের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু তাও বেশিদিনের জন্ত নয়; সন্ধ্যাসংগীতে এসে এই প্রভাবও অপসৃত হয়েছে।

যে সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলাকাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল, তখন বিহারীলালের কাব্যে অন্তর্মুখিতা প্রাধান্ত লাভ করেছে। এই অন্তর্মুখিতার ইশারা রবীন্দ্রনাথকে পথের সন্ধান দিয়েছিল, এর বেশি আর কিছু নয়। "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কবির নিজের কথা" প্রথম বিহারীলালই শোনালেন, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন (দ্রঃ 'আধুনিক সাহিত্য')। বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল কাব্যের নিকট কাব্যঋণ রবীন্দ্রনাথ বারবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু, না, তা ঋণ নয়, গ্রহণ, আত্মস্বীকরণ, সম্পূর্ণ নিজের করেই তা তিনি গ্রহণ করেছেন।

বিহারীলালের প্রভাব রয়েছে বনফুল, কবিকাহিনী ও শৈশবসংগীত কাব্যে। তারপরই সন্ধ্যাসংগীতে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত। মনে হয় এইজন্তই রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বের সমুদায় রচনাকে (অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড) স্বীকার করতে চান নি।

বিহারীলাল যে হেমচন্দ্রের মতো ক্রিয়াপদিক মিল ব্যবহার করেন নি এজন্ত রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যের—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এর মিষ্ট লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, শৈশবসংগীতে এরই অনুসৃতি—

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি
মলয় চলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ঢালি।

[illegible] প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া [illegible]।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে [illegible] নহে, কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।"

[জীবনস্মৃতি, 'সন্ধ্যাসংগীত']। কেবল ছন্দের ক্ষেত্রে নয়, ভাবের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীতে মুক্তি অর্জন করেছিলেন প্রতিভার অসাধারণ আত্ম-বিশ্বাসের জোরে।

বিহারীলালের 'শরৎকাল' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'শৈশবসংগীত', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' কাব্যে লক্ষণীয়। বিহারীলালের তিনটি সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথে অধিকতর সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিলো। প্রথমত, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ও তার মধ্যে একটি রোমান্টিক বিষাদের সুর আবিষ্কারে বিহারীলালের ইঙ্গিত সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয়ত, প্রেমের লৌকিক ও আধারগত সত্তার উর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম অধ্যাত্মসত্তা আছে, তার অনুভূতি বিহারীলালের কাব্যে (প্রেমপ্রবাহিণী, সারদামঙ্গল) প্রথম লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে (সোনার তরী) সে কাব্যভাবনা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তৃতীয়ত, রোমান্টিক কাব্যভাবনা থেকে মিস্টিক্ কাব্য-ভাবনায় উত্তরণ ঘটেছে, বিহারীলালের সংগীতশতক (১৮৬২) থেকে সাধের আসন (১৮৮৮) কাব্যধারা তার পরিচয়স্থল: রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে, কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) থেকে চিত্রা (১৮৯৬) কাব্যধারা তার প্রমাণ। চিত্রা কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক্ কাব্যভাবনা পূর্ণতা পেয়েছে, এখানে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এই তিনটি ক্ষেত্রে বিহারীলালের দান ও রবীন্দ্রনাথের স্বীকরণ ও সৃজন-ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান লেখকের "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

উনিশ শতকের শেষ পাদে সমসাময়িক কবিদের কাব্যসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভা-বিচারে এই দিকটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় নি। এই আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হবে বলে আমার ধারণা যে রবীন্দ্রপ্রতিভা অমূল-তরু নয়, তা সমকালের কাব্যপরিবেশ থেকে আলো বাতাস গ্রহণ করেছে, সহযাত্রী কবিদের কাব্যভাবনায় অংশ নিয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ও বিষাদ: কাব্যের তিনটি মূল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে আন্তরিক বেদনাকে বাণীরূপ দান করেছিলেন, তা সমকালীন কবিদের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল।

প্রথমেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার আলোচনা করা যাক্। যৌবনের ও প্রেমের জয়গান রচনায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীর অভাব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কাব্য 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। সমকালের যে-সব কবি ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন—বলদেব পালিত ('কাব্যমালা' : ১৮৭০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('শ্রাবণী' : ১৮৯৭), মুন্সী কায়কোবাদ ('অশ্রুমালা'), হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ('বিনোদমালা': ১৮৭৮, 'মালতীমালা', ১৮৯৯), গোবিন্দচন্দ্র দাস ('প্রেম ও ফুল' : ১৮৮৮, 'কুঙ্কুম' : ১৮৯২, 'কস্তুরী' : ১৮৯৫, 'চন্দন' : ১৮৯৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন ('অশোকগুচ্ছ' : ১৯০০)।

কড়ি ও কোমলের রচয়িতা স্থূল মানবতার কবি। এ কাব্যের প্রেম পার্থিব প্রেম। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয়গানে এ কাব্য মুখরিত। এখানে কবির মনে হয়, "আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।" প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে নারীর প্রেমসাহচর্য বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তার আলোচনা আছে এই কাব্যে। এখানে স্মর্তব্য, শুধু কামনাগন্ধী, বাহ্য মিলনে পরিসমাপ্ত প্রেম কোনদিনই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নি, ইন্দ্রিয়লালসা কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুষমাকে খণ্ডিত করে নি।

বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা'য় ভোগের উল্লাস, যৌবনের চাঞ্চল্য, আর 'কড়ি ও কোমল'-এ ভোগের শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, যৌবনের স্বপ্ন। দেহ-কামনার সংকীর্ণ সীমাকে লঙ্ঘন করে গেছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট-নিচয়, বলদেব তা পারেন নি। একই বিষয়ে রচিত কবিতার উদ্ধৃতিতে একথা স্পষ্ট হবে।

স্তনের বর্ণনায় বলদেব বলেছেন :

> পল্লবস্বরূপ ধনি এ করপল্লবে
> রাখিব ঘটের মুখে কাম মহোৎসবে।
> সিন্দুরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছটা
> অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটা॥

একই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

> প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
> উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।

হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর
হেরো নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির॥

নারীপ্রেমের পবিত্রতাকে রবীন্দ্রনাথ কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, স্তনযুগলের প্রতি কামজ আকর্ষণ নয়, রোমান্টিক আকর্ষণ এখানে প্রবল।

আরও একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'বিদায়', মুন্সী কায়কোবাদের 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' ও 'বিদায়ের শেষ চুম্বন' ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দাও দাও একটি চুম্বন'—চুম্বন-বিষয়ক এই কবিতা-চতুষ্টয়ের সঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র 'চুম্বন' সনেটের তুলনা করা যায়। রবীন্দ্র-নাথের সনেট এই কবিতা চতুষ্টয়ের পূর্বেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের সমুন্নতিতে, রোমান্টিক কল্পনার সমারোহে, শালীন চিত্রণে। পরপর চারজন কবির চুম্বন বর্ণনার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করছি, এতেই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

[এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থের তৃতীয় ও নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

মুন্সী কায়কোবাদের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা :

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন?
যবে তুমি মুক্ত কেশে
ফুলরাণী বেশে এসে,
করেছিলে মোরে প্রিয়া স্নেহ আলিঙ্গন।
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন?
—'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন'

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর প্রীতি-প্রসন্ন চিত্তের আবেদন :

আর নয়, বিদায় লো! যাই এইবার,
সুরক্ত অধরোপরি
বিদায় চুম্বন করি,
চাপিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার,
হাসিয়া বিদায় দাও, প্রেয়সী আমার। —'বিদায়'

দেবেন্দ্রনাথের দুর্বার কামনা :

দাও, দাও, একটি চুম্বন

মিলনের উপকূলে সাগর সঙ্গমে
দুর্জয় বানের মুখে বিষ ভাসাইয়া সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

—'দাও দাও একটি চুম্বন'

আর রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক তীর্থাভিসারের হর্ষ ও আবেগ :

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।...
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন॥

প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা এখানে ইন্দ্রিয়লালসা ও দুবার কামনার দ্বারা খণ্ডিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বতঃই প্রমাণিত।

আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব ছিল না। মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), ও চিত্রা (১৮৯৬) কাব্যের আদর্শান্বিত প্রেমের সহগামী কাব্যসাধনা হল সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা' (১৮৯৬), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রাবণী' (১৮৯৭), সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫), প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' (১৯০০) ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' (১৮৯৮) ও 'গীতিকা'।

বাস্তবজগতে প্রেমের বৃথা সন্ধান, প্রেমের ব্যাখ্যাতীত রহস্য, সংসার জীবনে অধীরতা ও সংশয়ের তীব্রতা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে আত্মিক মিলনের জন্য বৃথা ক্রন্দন 'মানসী' কাব্যে রয়েছে। প্রেমাকর্ষণ মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ, প্রেমের রহস্য দুর্জ্ঞেয় ও প্রেমিক হৃদয় অন্তহীন রহস্যের নিলয়, তার পরিচয় 'সোনার তরী'তে আছে। বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচনায় প্রেমের অতিবাস্তব আকর্ষণ ও রহস্যময় রূপ, দুইটি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষা ও বিরহ তত্ত্বটিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন 'সোনার তরী'তে এইভাবে—

আজি বর্ষা গাঢ়তম
নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে। —'হৃদয় যমুনা'

বলেন্দ্রনাথের কাব্যে এরই প্রতিধ্বনি :

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি। —'অন্তরবাসিনি'

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যে একই ভাবনার প্রতিচ্ছবি :

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ
নবস্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে
ছোটে গর্বভরে,...রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি, প্রাণে জাগে তব মুখশশী।
তবু একবার এস নয়ন সম্মুখে
বাহুবন্ধে তনুখানি বাঁধি লহ বুকে। —'বিরহ'

বর্ষার প্রকৃতিতে বিরহীচিত্তের আপন বেদনাবিবশ হৃদয়ের সমর্থন পায়, বাংলা কাব্যে এই তত্ত্বটির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ।

বাস্তব জগতে প্রেমের বৃথা সন্ধান ও তার জন্য নিষ্ফল সূচনা বিহারীলালের 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যে, তার পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে ও তারই বিশ্বস্ত অনুসৃতি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা' কাব্যে। এই কাব্যে 'নিখিল প্রয়াস', 'পরিতাপ', 'হৃদয়যমুনা', প্রমুখ কবিতার নামপরিচয়ে মানসী-সোনার তরীর আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত। 'সোনার তরী' কাব্যে প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও মৃত্যুর সংগে প্রেমের একাত্মতা সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের (হৃদয়যমুনা : দোলা) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা ও চিত্রকল্পের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ('সোনার তরী,' 'ঝুলন' ও 'হৃদয়যমুনা')।

সুধীন্দ্রনাথের ও সরোজকুমারী দেবীর প্রেম সাধনায় যে নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণের সুর আছে, তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বর্তমান।

জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনার ফল জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে সমর্পণের অপূর্ব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের আদর্শায়িত রূপচিত্রণ, তার অতিবাস্তব পরিণতি প্রেমিকাকে জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ, প্রেমের রহস্যময়তা এবং কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনার ভেদ-লুপ্তি সোনার তরী—চিত্রা কাব্যকে মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বন্দনা :

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।...
তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহসুকোমল,—
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল করুণা মানি
সব হতে তবে সার্থক হবে ব্যর্থ সাধনখানি। ('সাধনা'—চিত্রা)

সুধীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপিণী বন্দনা :

কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে
বিচিত্ররূপিণী ! কত দিন কত সাজে
দেখেছি তোমায় :......পরাণ বুভুক্ষু
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি
তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি।
চিরতরঙ্গিত এই জীবনসাগরে
এতদূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে :
যাহা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে
এবে তোমা কাছে যাচি—জান ত সুন্দরি
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী
কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি
জীবনের সুধাপাত্রখানি দাও ভরি,
তার পর রথচক্রতলে বাঁধি মোরে
যেথা খুসি নিয়ে যেয়ো জন্ম জন্ম ধরে।
('অদৃষ্টদেবী'—সোনা)

আর সরোজকুমারী দেবীর ব্যাকুল প্রার্থনা :

জেনেছি বুঝেছি দেবী বিফল সাধনা।
শিখিনি করিতে পূজা ও দুটি চরণ
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা,
মিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন।……
তবু দেবী আশাহীন নবীন আশায়
গেঁথেছি যতনে এই ঝরাফুলগুলি,
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায় ;
পরিবে না গলে তুমি লবে না কি তুমি ?
না হয় রাখিয়া দাও চরণের ছায়,
মুহূর্ত বিফল আশা যদি মেটে হায়।

['সাধনা'—হাসি ও অশ্রু]

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্ব ও অতিবাস্তব প্রেম-সাধনা এই দুজন কবির কাব্যে সমর্থিত হয়েছে, এতে রবীন্দ্রপ্রতিভার জয় সূচিত হয়েছে।

কেবল ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও আদর্শান্বিত প্রেমের ক্ষেত্রেই নয়, রোমান্টিক বিষাদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একক ছিলেন না। রোমান্টিক বিষাদ বাংলা গীতিকাব্যে প্রথম দেখা দিল বিহারীলালের কাব্যে। বিহারীলালের প্রকৃতিপ্রেম, নির্বিশেষ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সন্ধান, অম্লান প্রসন্নতা এবং ধ্যানমগ্নতা রবীন্দ্রমানসের যথার্থ অনুকূল হয়েছিল। তবে বিহারীলালের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে কবি হৃদয়-অরণ্যে পথসন্ধান করে ফিরছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে কবিকে হৃদয়-অরণ্য থেকে মুক্তির পথ দেখাল, যথার্থ মুক্তি ঘটল প্রভাতসংগীতে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তিলাভ করলেন, তা এই বিষাদ থেকে মুক্তি ; এ কবিতায় প্রসন্ন আনন্দসংগীতে স্বরময় প্রভাতের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপিত হল।

এই মুক্তি কবির নিজের মধ্য থেকেই ঘটেছে, বাহিরের কোন শক্তি কবির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর সমকালীন কবিরা রোমান্টিক বিষাদ অপেক্ষা শোক ও আত্মবিলাপের হাহাকারেই নিজেদের নিঃশেষিত করে দিয়েছিলেন। তাই রোমান্টিক বিষাদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবার শেষ প্রসঙ্গ: সমকালের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতার বিচার। বিহারীলালের 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে' (সংগীত-শতক : ১৮৬২) ও

সুধাময় প্রণয় তোমার
জুড়াবার স্থান হে আমার:
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

[বঙ্গসুন্দরী : ১৮৭০]

এবং হেমচন্দ্রের—হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।

['যমুনাতটে', কবিতাবলী : ১৮৭০]

প্রকৃতি-কবিতার উপযুক্ত পটভূমি রচনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্য-ক্ষেত্রে এলেন তখনও তিনি হৃদয়-অরণ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হন নি। এই সময় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রকৃতিতে নীতি ও গুরুচিন্তা আরোপ করতেন। তখনকার দিনে প্রকৃতি-কবিতা রচনার এই ছিল প্রচলিত রীতি। রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিমতা ও সজ্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল যা করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ তা করলেন। কবিতাকে জীবন ও প্রকৃতির কাছে নিয়ে এলেন।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তাই একাধিক কারণে মূল্যবান। বিষাদ থেকে, কৃত্রিমতা থেকে, নীতি বা তত্ত্বারোপ প্রবণতা থেকে প্রকৃতি-কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করলেন। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত আনন্দধারায় স্নাত হয়ে কবি প্রকৃতিকে দেখলেন, সমগ্র প্রকৃতি সেই বৃহৎ আনন্দের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। প্রকৃতিতে চিন্তারোপ না করে কবি তাকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে নিলেন; প্রকৃতি-কবিতায় নূতন ধারা প্রবর্তিত হল। সরোজকুমারী দেবী ('মধ্যাহ্ন'), বিনয়কুমারী ধর ('রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা'), স্বর্ণকুমারী দেবী ('শারদজ্যোৎস্না'), দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় এই নবদৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে অনুভূতিশীল নিসর্গের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বর্তমান লেখকের "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাতসংগীত), 'অহল্যার প্রতি' ও বর্ষা-বিষয়ক-কবিতা (মানসী) এবং 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী)—এই ক'টি উজ্জ্বল আন্তরিক গভীর কবিতায় বাংলা প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা এক মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হল। জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ আধুনিক কবিদের হাতে প্রকৃতি-কবিতার রূপান্তর ঘটার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্র-নির্ধারিত পথেই প্রকৃতি-কবিতার যাত্রাপথ সুচিহ্নিত হয়ে গেল। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবি মাতৃরূপা প্রকৃতিকে দেখেছেন, আর মানসীর বর্ষা-কবিতাগুলিতে সর্বজগদ্‌গত বিরহবেদনা ও রোমান্টিক বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনায় ও তার সংগে মানবহৃদয়ের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্কস্থাপনে রবীন্দ্রনাথ বোধ করি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ছাড়া আর সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি যে সুগভীর মাতৃপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, 'বসুন্ধরা' কবিতায় তার রসসমৃদ্ধ পরিণতি।

উনিশ শতকের শেষপাদে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও এই শতকের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। প্রকৃতি-বর্ণনায়, ইন্দ্রিয়াশ্রিত আদর্শান্বিত ও মিস্টিক্ প্রেমের উপস্থাপনায় এবং রোমান্টিক বিষাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় দানে সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য এতক্ষণ লক্ষ্য করা গেল। রূপতান্ত্রিকতা ও ভাবতন্ময়তা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, যৌবনের হর্ষ ও বেদনা, বাস্তবের কঠিন পেষণ থেকে মুক্তিসাধনা, আদর্শ ও সৌন্দর্যের সন্ধান : এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই ক্ষেত্রে সহযাত্রীর অভাব ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছি।

তবে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? রবীন্দ্রকাব্যে সকল ধারার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল ও এই সময় থেকেই বাংলা কাব্যে এক উন্নততর কবিকর্মের উদ্ভব হয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যসংসারে রবীন্দ্রনাথ একক নন, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ। শতাব্দীর সাধনার ফল রবীন্দ্রনাথেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ শতকের গীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

প্রতিভার পরিচয় কেবল অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায় নয়, অজস্র সহস্রবিধ রূপকর্মে ও ভাবের বহুচারিতায়। তাই রবি-প্রতিভার পরিচয় কেবল দু-একটি ক্ষেত্রে নয়, নানা ক্ষেত্রে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বিশেষ করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তা সংকীর্ণপরিধিতে সীমাবদ্ধ। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, অর্ধ-শতাব্দীকাল (১৮৯০-১৯৪০) রবিপ্রতিভা কাব্যক্ষেত্রে নিত্য নব নব সৃষ্টি করেছে। এই কালসীমার মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ তিনটি গোষ্ঠীর কবিদের প্রভাবিত করেছেন। উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম দশকে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সরোজকুমারী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতিতে নিষ্প্রভ হয়েছেন। শেষোক্ত তিন জন রবীন্দ্র-পথ থেকে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র কাব্যধারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং পরাজিত হয়েছিলেন। এরপর বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে কবিরা এসেছেন, তাঁরা বিরোধিতার প্রয়াস না করে, রবীন্দ্রনাথের কাছে বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিরা রবীন্দ্রছায়াতলে কাব্যজীবনের যাত্রা-সূচনা ও সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। শেষোক্ত তিনজনের কবিতায় পরবর্তী কাব্যধারার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এর পরেকার কবিগোষ্ঠী এসেছেন 'তিরিশের দশকে'। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধারূপে এসেছেন। অদ্যাবধি এঁদেরই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি।

রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব উপরোক্ত তিন গোষ্ঠীর কবিরা অতিক্রম করতে পারেন নি। কি রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী, কি আধুনিক কবিগোষ্ঠী, কি দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-বলেন্দ্রনাথের গোষ্ঠী—সকলেই রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে দুটি প্রাসঙ্গিক স্বীকৃতি তুলে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম কবি শ্রীসজনীকান্ত দাস বলেছেন, "সত্য কথা বলিতে গেলে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের প্রায় সকলেই আমরা যেন মূল পায়েন রবীন্দ্রনাথের দোহারকি করিয়াই সার্থক হইয়াছি; দুই চারিজন একটু দূরে সরিয়া বেসুরা গাহিবার চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু শেষাশেষি ওই রবীন্দ্র-রূপ-সাগরেই ডুব দিতে হইয়াছে, আন্-ঘাটে তরী বাঁধা আর হয় নাই।" ('আত্মস্মৃতি', তৃতীয় তরঙ্গ)। আর আধুনিক কবিসমাজের অন্যতম প্রধান শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মান নি এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সূক্ষ্ম তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায় নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে-অবস্থান্তর ঘটেছে, তা এই: তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র; ফসলের জাত বদ্‌লাতে পারে নি!" ('কুলায় ও কালপুরুষ')।

দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র কাব্যধর্মে বিশ্বাসী কবির কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একই শ্রদ্ধেয় উক্তি রবি-প্রতিভার স্বীকৃতির পরিচয়স্থল। রবীন্দ্রযুগের কবিতার আলোচনায় তাই এ-সত্য বিস্মৃত হলে চলে না যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে অপরিহার্য সত্য। রবীন্দ্রানুসারী কবিরা কীভাবে অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতার বৃত্তপথে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থতাকে বরণ করে নিলেন এবং রবীন্দ্র-প্রভাব-অতিক্রমেচ্ছু কবিরা কীভাবে রবীন্দ্র-কক্ষপথ থেকে সরে গিয়ে সার্থকতা লাভ করলেন, তার অন্বেষণেই বর্তমান আলোচনার সার্থকতা নিহিত। পল্লীপ্রীতি, ঐতিহ্য-আনুগত্য, মুগ্ধ আত্মরতি, ভক্তিপ্রবণতা, ভাববিলাস, ছন্দচাতুর্য ও মঞ্জুল বাক্‌সর্বস্বতা, নগর জীবনের প্রতি বিরাগ ও রূঢ় বাস্তবের অস্বীকৃতি রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কাব্যসাধনায় লক্ষ্য করা যায়। বিপরীত দিকে আধুনিক কবিতায় লক্ষ্য করি, তা একান্তভাবেই নগরভিত্তিক ও সমাজ-সচেতন। আমাদের কালের মধ্য দিয়ে দুটি রুধির নদী প্রবাহিত হয়েছে; তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন আশা-ভরসাকে নির্মূল করেছে; ফলে এসেছে তিক্ততা, নিরাশা, হতাশা ও বেদনা; এসেছে রোমান্টিক স্বপ্নাবেশের দ্রুত সমাপ্তি ও প্রখর বাস্তবের সূর্যালোকোদ্ভাসিত

নোতুন জগৎ। সংস্কারমুক্তি ও কেন্দ্রাপসরণ, বিশ্ববীক্ষা ও বৈদেশিকতা, নাগরিকতা ও তির্যকদৃষ্টিসমন্বিত জীবনবোধ, অকপট সত্যনিষ্ঠা ও রূঢ় বাস্তবানুভূতির রূপায়ণে আগ্রহ আধুনিক কবিতায় বড়ো হয়ে উঠেছে। আর এই-সব লক্ষণের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি, অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতার দিন শেষ হয়েছে, বাংলা কাব্যে পালাবদল হয়েছে।

॥ ২ ॥

এই পালাবদল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন, একথা অবশ্যস্বীকার্য। 'পরিশেষ' (১৯৩২), 'পুনশ্চ' (১৯৩৪) ও 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) তার পরিচয়স্থল। প্রথম বিশ্বসমরের পর ইয়োরোপে যে সামগ্রিক কালান্তর সূচিত হল এবং যা পরে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নিল, বাংলা সাহিত্যে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সচেতন হলেন। প্রথম বিশ্বসমরের ফলে মানুষের এতাবৎকালের মানবিক মূল্যবোধসমূহের প্রতি আস্থা বিনষ্ট হল, সামাজিক সংস্থিতি ও পারিবারিক সংহতি বিচলিত ও বিপর্যস্ত হল, ঐতিহ্য থেকে মানুষ বিচ্যুত হল। এরই ফলে এলিঅটের 'পোড়ো জমি' (Waste Land) দেখা দিল এবং দ্রুত মানবজীবনে সমাজ-মানসে তার অধিকার বিস্তার করল। রোমান্টিক স্বপ্নাবেশের দ্রুত সমাপ্তি ঘটল, ঐতিহ্যভ্রষ্ট বিশ্বাসরিক্ত বাস্তবানুভূতির জয় ঘোষিত হল। সমরান্তিক হতাশা, বেদনা, সংশয়, সর্বগ্রাসী নিরাশা কবিতায় ছায়া ফেলল। এলিঅট-অডেন-স্পেণ্ডারের কবিতা তাই পাঠককে সুখী করল না, সংশয়পীড়িত করল।

বোধ করি প্রথম সমরোত্তর বিশ্ব সেদিন কবিতার মৃত্যুদিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কবিতায় তার বিন্দুমাত্র আভাস পাই না। কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস, যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় পল্লীপ্রীতি, ঐতিহ্যানুস্মৃতি, সরল প্রকৃতিদৃষ্টি ও রোমান্টিক জীবনধ্যানই প্রথম ও শেষ কথা হয়ে রইল। তাঁদের কাব্যজীবনের অধিদেবতা রবীন্দ্রনাথও যে পরিবর্তিত হচ্ছেন, তিনি যে সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনার রোমান্টিক স্বপ্নলোক থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন, তিনি যে খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অধ্যাত্মলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বলাকার নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝার গর্জন শুনে অন্য কোনোখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, কে-

কথা রবীন্দ্র-ভক্তরা একেবারেই চিন্তা করেন নি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজি নজরুল ইসলাম সেদিন এই সমাজে ও মনের জগতে কালান্তরের প্রভাব অস্পষ্টরূপে অনুভব করেছিলেন, কবিতায় বিশ্বাসরিক্ত সংশয়পীড়িত আনন্দভ্রষ্ট অনুভূতিসমূহকে কাব্যরূপদানের প্রয়াস করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী ভাঙা-গড়া ওলোট-পালটের কথাটা প্রকাশ করেছিলেন যে-ভাবে, তা প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ যুগ-সচেতন কবি, রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী নন। কিন্তু এই সর্বধ্বংসী সর্বগ্রাসী কালান্তর রবীন্দ্র-কাব্যমানসের অনুকূল নয়, প্রতিকূল, সেকথাও অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ সমাজে সাহিত্যে চিন্তালোকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে,—

"গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিলো, তার বহুযুগ প্রচলিত আদব ও আব্রুতা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেলো, দীর্ঘকাল যে সমাজ স্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেলো, মানুষ যে সকল শোভন রীতি, কল্যাণরীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র বলে জানত তাকে দুর্বল বলে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায়ে অবজ্ঞা করতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল।"

কিন্তু, না, কবিতার মৃত্যুদিন ত্বরান্বিত হল না, বরং কবিতা পাশ্চাত্ত্যে নব প্রেরণায় উজ্জীবিত হল। রেনেসাঁসের ফলস্বরূপ যে রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গত শতকের সাহিত্যে মৌল প্রেরণা ছিল, তা প্রথম বিশ্বসমরের আঘাতে প্রেরণা নিঃশেষিত হবার উপক্রম হল। কবিতার পথ দ্রুত পরিবর্তিত হল। সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনা, দুই-ই প্রবল হয়ে উঠল এবং এ'দুয়ের দ্বন্দ্বে শিল্পিমানস দ্বিধাগ্রস্ত হল। প্রকৃতিপ্রেমের স্থানে এল নাগরিক জীবন-অনুরক্তি, সুকুমার কলানুভূতির স্থানে এল জটিল মনস্তত্ত্ব, নিশ্চিন্ত সৌন্দর্যধ্যানের স্থানে এল উপক্রান্ত চিন্তাধারা, ভাবাবেগের স্থানে এল মননশীলতা, বহির্বিশ্ব ও বাস্তব বড় হয়ে উঠল, ঐতিহ্যানুস্মৃতি পরাজিত হল, গূঢ় অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা ও অন্তর্মুখিতা বড় হয়ে উঠল।

এর ফলে আধুনিক কবিতার দিগন্ত প্রসারিত হল। বর্তমান শতকের প্রথম পাদে পাশ্চাত্ত্য কাব্যজগতে নানা বিরোধী আন্দোলন—স্ববিরোধী ও

পরস্পর-বিরোধী কাব্যান্দোলন কবিতাকে মৃত্যুর অভিশাপ থেকে রক্ষা করে নোতুন যাত্রাপথের প্রেরণা সঞ্চারিত করে দিল। ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবোধ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে, শান্তি ও সৌন্দর্যের শুভাবিতাবলী মূল্যহীন হয়েছে, প্রকৃতিপ্রেম ও ঐতিহ্যানুরাগ শ্রদ্ধার আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অ-কাব্য-চিন্তা কাব্যলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে ও গৃহীত হয়েছে। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব কবিতায় দেখা দিল। স্যুররিয়ালিজম্, দাদাইজম্, কিউচারিজম, ইম্প্রেশনিজম, সিম্বলিজম্, একসিসটেন্‌শিয়ালিজম্ প্রভৃতি নানা মতবাদের ভীড়ে আধুনিক কবিতা পথ হারাচ্ছে ও পথ সন্ধান করছে।

প্রথম সমরোত্তর পাশ্চাত্ত্য কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি (১৯৩২ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থভুক্ত) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধ সংকলনের আলোচনাগুলি। এই সব ক'টি প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ খ্রীঃ। এই সময়েই বাংলা কাব্যে পালাবদল হয়েছে। 'পুনশ্চ' কাব্যের রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৩২, প্রকাশকাল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আধুনিক কাব্যধারার সূচনা ও প্রসার লক্ষ্য করা গেছে। ১৯২৩-এ 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ১৯৩০-এ 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যেই আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের নেতৃস্থানীয় কবিদের (প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাই 'তিরিশের' ও 'চল্লিশের' দশকে বাংলা কাব্যের কোনো পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

আর এই সময় রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ কী করেছেন, তার সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শতনরী' (১৯৩০), যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'নীহারিকা' (১৯২৭) ও 'মহাভারতী' (১৯৩৬), কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'অজয়' (১৯২৭) ও 'তূণীর' (১৯২৮), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরুশিখা' (১৯২৭) ও 'মরুমায়া' (১৯৩০), মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' (১৯২৬), কালিদাস রায়ের 'আহরণী' (১৯৩২), পরিমলকুমার ঘোষের 'নারী-মঙ্গল' (১৯২৬), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'আহিতাগ্নি' (১৯৩২) ও 'মনো-

মুকুর' (১৯০৬), নজরুল ইসলামের 'ফণিমনসা' (১৯২৭),'সিন্ধুহিন্দোল' (১৯২৭), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), সজনীকান্ত দাসের 'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল' (১৯২৯), 'বঙ্গরণভূমে' (১৯৩১), 'মনোদর্পণ' (১৯৩১), 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৯৩১) প্রভৃতি কাব্য এবং শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, প্যারী-মোহন সেনগুপ্ত, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী প্রমুখের কবিতা এই পালা-বদলের কালে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যে সচেতনতা এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ছিল, তা এঁদের কাছে পাওয়া যায় নি। কাব্যে আধুনিকতার সমস্যা, মর্জি-বদলের কথা এঁদের ভাবায় নি। সাহিত্যে আধুনিকতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-এ লিখলেন, 'প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর-নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ পূরণ করতে পারেন নি, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য খানিকটা পূরণ করেছেন মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল। বাকিটা পূরণ করলেন নেতৃস্থানীয় আধুনিক কবিরা। রবীন্দ্রানুরাগের অন্য একটি দিক প্রকাশিত হল প্রমথনাথ বিশী, নিশিকান্ত, কানাই সামন্ত প্রমুখের কবিতায়।

॥ ৩ ॥

প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তীকালে ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ফরাসি ও জর্মান কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চল্লিশের দশকে লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের ইংরেজি কাব্য সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী ছিলেন তার প্রমাণ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ (১৯৩২) রয়েছে। কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর খানিকটা দ্বিধাও আছে। ১৯৩৪-এ তিনি 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধে দ্বিধা ও সংশয়ের সুরে বললেন—"ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ বারবার যুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা, আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে

এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান।...আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্ধা মাত্র।"

['সাহিত্যের স্বরূপ']

রবীন্দ্রনাথ খোলা মনে পাশ্চাত্ত্য কাব্যে পালা-বদলকে গ্রহণ করতে পারেন নি, এ-সত্যটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাপি তিনি সহানুভূতি ও আগ্রহের আধুনিকতাকে বোঝবার প্রয়াস করেছেন, তার পরিচয় পাই 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। এখানে তিনি প্রথম সমরোত্তর ইংরেজি কবিতার আলোচনা করেছেন এবং তিনজন কবির কবিতা মূলে ও অনুবাদে উদ্ধার করেছেন। ইংরেজি রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ গভীর, এ-কথা অনস্বীকার্য। সেই অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি সমরোত্তর ইংরেজি কবিতার রস গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন নি। তিনি বলেছেন, "এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" আধুনিকতার চারিত্র-লক্ষণ তিনি আবিষ্কার করেছেন। নৈর্ব্যক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবতা—এই তিনটি চারিত্র-লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। সমরোত্তর ইংরেজি কবিতাকে তিনি মন খুলে গ্রহণ করতে পারেন নি, তার কারণস্বরূপ বলেছেন, "সায়ান্সেই বল আর আর্টে বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।" আরো বলেছেন, "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক। কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির

আনন্দ, এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই।"

["আধুনিক কাব্য" : 'সাহিত্যের পথে']

'শাশ্বতভাবে আধুনিক' ও 'আধুনিক'—এ' দুয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন এবং 'আধুনিক'-কে তিনি সমর্থন করেন নি। 'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি'কে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যক্তিগত চিত্তবিকার' ও 'কালাপাহাড়ি তাল ঠোকা' বলে ভর্ৎসনা করেছেন। বিষয়ের আত্মতা বা সুনিশ্চিত আত্মতা-ই আধুনিক কবিতার 'ক্যারেক্টার' এ'কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এবং এলিঅটের কবিতায় তার সমর্থন পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে এলিঅট, এজরা পাউণ্ড, এমি লোয়েল ও এডুইন আর্লিংটন রবিনসনের কবিতা উদ্ধার করে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সাহিত্যের মাত্রা' আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সর্বত্রই তাকে (সাহিত্যনীতিকে) আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবী করবই, অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্ তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে।" ['সাহিত্যের স্বরূপ']

এই সতর্কবাণী মনে রেখেই রবীন্দ্র-যুগের কবিতায় আধুনিকতার সন্ধানে আমরা অগ্রসর হতে পারি। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের চিন্তাসম্পদের অপ্রতুলতা ছিল না এবং রূপকর্মে বেশ কিছুটা দক্ষতা ছিল, সর্বোপরি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের আশ্রয় ছিল। কিন্তু তবু তাঁরা আধুনিকতার বাণীবাহক হতে পারলেন না। অলঙ্কৃত সমিল কবিতা-নির্মাণে ও ছন্দোলালিত্যে অত্যাসক্তি এবং মঞ্জুল বাক্-সর্বস্বতায় অতিনির্ভরতা রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কবিতায় দেখা গেল। যুগচেতনা বা সমাজচেতনা তাঁদের কাছে প্রাধান্য লাভ করল না। উপরি-ধৃত কাব্যতালিকায় যাঁদের উল্লেখ করেছি, 'তিরিশের' দশকে তাঁদের কবিতায় এই ধারণার সমর্থন মেলে। শ্রীবুদ্ধদেব বসু এঁদের ব্যর্থতার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন এই কথায়—"রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ অন্যান্য কবিদের মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাদোষের সৃষ্টি করেছিল। পঁচিশ বছর আগেকার বাঙালি কবিরা শিথিল ও তরল হওয়াটাকেই গৌরবের মনে করতেন; অকারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, প্রকৃতি-বর্ণনার বাড়াবাড়ি, ছন্দ-মিলের অতিপ্রকট চাতুর্য, এ-সব জিনিষেরই তখন বাজার-দর ছিলো চড়া।

সর্বোপরি, কবিরা তখন ছিলেন সম্পূর্ণই আত্মকেন্দ্রিক ; অর্থাৎ যে-বিষয় নিয়ে লিখেছেন তার দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের দিকে তাকিয়ে লেখাই তাঁদের অভ্যাস ছিলো। সুতরাং তাঁদের উৎকৃষ্ট রচনাও ভাববিলাসের উচ্ছ্বাস ছাড়িয়ে বেশিদূর উঠতে পারেনি ; যদি বা কখনও কিছু ক্ষীণ বক্তব্য থাকতো, অজস্র ব্যঞ্জনাহীন কথার চাপে তা দম আটকে মারা যেতো কয়েক পংক্তির মধ্যেই।" ('কালের পুতুল')

করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস-যতীন্দ্রমোহন-নরেন্দ্র দেব কি কবিতায় রবীন্দ্র-কথিত 'চরিত্রের প্রাণগত রূপ' রক্ষা করতে পেরেছিলেন? তাঁরা সমাজচেতনার পরিচয় বিশেষ দেন নি, মনোজীবনের দুনিয়াব্যাপী সংকটের ছায়াপাত হয় নি তাঁদের কাব্যে, সনাতন মূল্যবোধের বিনষ্টি-জনিত সংশয়-বেদনায় তাঁদের চিত্তপীড়নের কোনো পরিচয়ও পাওয়া যায় নি। তাই শিল্পকর্মে সজ্ঞান নিষ্ঠা এবং আত্মকেন্দ্রিক অতি-ব্যবহৃত কাব্যভাবনায় যুগচেতনা তথা প্রাণগত রূপের পরিচয় প্রকাশিত হয় নি, একথা অনস্বীকার্য। শব্দ বা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্ত, অকারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, অতিপ্রকট মিলের চাতুর্য, অতিকথন, উৎকট প্রসঙ্গ, অতিমিষ্টতা, ধ্বন্যাত্মক শব্দমোহ, টুং-টাং মিষ্টি সুরের মাদকতা, আরবী-ফারসী শব্দমোহ, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দমোহ, ব্যঞ্জনবর্ণের কসরৎ, তালের ঝোঁক ইত্যাদি নানা 'চিত্র-কাব্য'সুলভ ত্রুটি সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বাংলা কাব্যে যখন পালা-বদল হচ্ছে, তখন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্য প্রকাশিত হল। বাস্তব সত্যের দার্শনিক ও আধুনিকতার পুরোধা-কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 'পুনশ্চ' কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। গদ্যকবিতা যে বহিরঙ্গ পরিবর্তন নয়, তা যে অন্তর-পরিবর্তনের সূচক, তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া গেল। এই বছরই কালিদাস রায়ের 'আহরণী' কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হলো। এই সংকলনে পালা-বদলের আভাসমাত্র নেই। এরই একটি কবিতা চিত্র-কাব্যের উদাহরণ-রূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কবিতাটির নাম 'গঙ্গা'। সুদীর্ঘ গঙ্গা-মাহাত্ম্যমূলক সুগ্রথিত তালিকা-রূপে এটি বিচার্য। এর প্রথম স্তবকটিতে 'চিত্র-কাব্যে'র লক্ষণগুলি প্রকট হয়েছে :

নমি সনাতনী সারাৎসারা।
অতীতের সাথে ভবিষ্যতের যোগবন্ধন তোমার ধারা।

তুমি তরলিত সৃজনকামনা বিধি-হৃদয়-কুহর হ'তে
কবে বাহিরিলে সৃষ্টির পরমেষ্টি-বিভূতি ভাসায়ে স্রোতে ?
কবে কোটি কোটি তৃষিত কণ্ঠ গাহিল তোমার আমন্ত্রণী,
নেমে এলে জেগে দুর্বার বেগে তুলি মেঘে মেঘে কলধ্বনি।
বহি কোটি কোটি মুক্ত জীবের মুক্তিস্নানে পাবন বারি,
পতিতে তরিতে পাতক হরিতে নামিলে মহীতে দ্যুলোক ছাড়ি।

স্পষ্টই বোঝা যায় এটি গঙ্গার মাহাত্ম্যখ্যাপনে প্রণীত তালিকা—প্রথম থেকে শেষ স্তবক পর্যন্ত তার সুশৃঙ্খল বিস্তার। উদ্ধৃত স্তবকটির শেষ চরণে দাশরথি রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত-সুলভ শব্দক্রীড়াসক্তি ও মিলের অতিপ্রকট চাতুর্য লক্ষণীয়। পুনশ্চ, সত্যেন্দ্রনাথ-সুলভ তথ্য সমাহরণ ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনস্পৃহাও উপস্থিত। প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্ধ অনুস্মৃতি ও যুগচেতনার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি এই পঙ্ক্তিবর্ণনায় প্রকট। আভিধানিক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দমোহ এবং শব্দের পুনরাবৃত্তিও এখানে বর্তমান। বহির্মুখী উত্তেজনা এখানে প্রধান, অন্তর্মুখিতার কোনো পরিচয় নেই।

তাই একথা বলা যায় কবিতার মুক্তি এখানে সন্ধান করলে আমরা ব্যর্থ হবো। এই শোচনীয় ব্যর্থতাই আধুনিক কবিতার আগমনকে ত্বরান্বিত করেছে, এই সত্যই বর্তমান প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতাকে অতি-সারল্য ও অতি-তারল্যের চোরাবালি থেকে রক্ষা করলেন পরবর্তী নোতুন কবিরা।

॥ ৪ ॥

আশ্চর্য মনে হয় এ'কথা ভেবে যে, 'পুনশ্চ' কাব্যের মতো উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম এবং ভাবের ক্ষেত্রে অগ্রগামী আধুনিক কাব্য থাকা সত্ত্বেও কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-কালিদাস প্রমুখ কবিরা কিছুমাত্র প্রভাবিত হলেন না কেন ? এঁদেরই তিনজন খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন—মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল পূর্বোক্ত কবিদের থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। 'কল্লোলে'র কবিরা এই তিনজনের কাছেই আধুনিকতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

আধুনিক কবিদের দুজনের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি শোনা যাক।

অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, বজন-বাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল।......'পান্থ' বেরিয়েছিল 'কল্লোলে'র ত্রয়োদশ বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায়। সেই কবিতা 'আধুনিকতা'র সোপান।......অবিস্মরণীয় কবিতা। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ঐশ্বর্য। তারপর তাঁর 'প্রেতপুরী' বেরোয় অগ্রহায়ণের 'কল্লোলে'।"

['কল্লোলযুগ' ১ম সং পৃ ১৩৩-৩৬]

আর বুদ্ধদেব বলেছেন, "মোহিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত 'বিস্মরণী' যখন বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' দুটোই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'কল্লোলে'র অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুর।...

যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে তিন মাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সে ছন্দেরই একটি নির্দিষ্ট, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র কবিতাবলী।

আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবন্ধধর্মী যুক্তি তর্কের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা')—বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি, দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভীক

দেহাত্মবোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিক থেকে যেন একটা নিশ্বাস-ফেলা নিষ্কৃতি ছিল যতীন্দ্রনাথের সরল বৈঠকী দুঃখবাদে।"

['যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'—'কবিতা', আশ্বিন ১৩৬১]।

এইসব স্বীকৃতি থেকেই আধুনিক কবিতার জন্মলগ্নে মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথের কিছুটা প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে নজরুলের কথাও স্মর্তব্য। মোহিতলালের দেহাত্মবোধ ও জীবনসম্ভোগবাদ, নজরুলের বাঁধ-ভাঙা তারুণ্যের দুর্দম আবেগ, যতীন্দ্রনাথের আত্মদ্রোহী দুঃখবাদ ও রোমান্স-বিরোধিতা বাংলা কাব্যে পালা-বদলের ইঙ্গিত বহন করে আনল।

অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা', প্রেমেন্দ্রর 'প্রথমা', বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা', ও জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' কাব্যে সভ্যোক্ত তিন কবির অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই অনুসৃতি ক্ষণকালের। 'চল্লিশের' দশকে আধুনিক বাংলা কাব্য নিজ সাধনা ও শক্তিতে পূর্ণ আস্থা রেখেই প্রতিষ্ঠা লাভ করল। অচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব অনতিকালের মধ্যেই স্বপ্রতিষ্ঠ হলেন।

যে দুজন আধুনিক কবি এই স্বপ্রতিষ্ঠ বিজয়ের মূলে আছেন, তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম জন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর, দ্বিতীয় জন 'পরিচয়' গোষ্ঠির কবি।

জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' কাব্যে মোহিতলাল-নজরুলের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। রূপকর্মে ও রোমান্টিক ভাবনায় তিনি সেখানে স্বাতন্ত্র্যহীন তরল রোমান্টিক কবিতা-রচয়িতামাত্র। এই কাব্যের 'বনের চাতক—মনের চাতক' কবিতা তার পরিচয়স্থল:

> সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ শুঁড়িখানায় বাজে!
> চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুণীর ঠোঁটের মাঝে
> লুকিয়ে আছে সে কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে!

কিন্তু পরবর্তী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে জীবনানন্দ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হলেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় শুরুতেই যে বর্ণনা ও বক্তব্য, তা এতই স্বতন্ত্র, এতই বিশিষ্ট যে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হয় না। মোহিতলাল-নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ—কোনো প্রভাবই এখানে থাটল না। একজন সিদ্ধ কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'মৃত্যুর আগে' কবিতার নামে ও বর্ণনভঙ্গিতে, শব্দচয়নে ও চিত্রকল্পসৃষ্টিতে এতই স্বাতন্ত্র্য যে মনে হয় এক মুহূর্তেই একটি সম্পূর্ণ অচেনা কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হলাম:

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

অবশ্য 'ঝরা পালক' কাব্যের দুয়েকটি কবিতায় ('কবি', 'সেদিন এক ধরণীর') এই পরিবর্তনের আভাস ছিল। 'কবি'র বর্ণনায় জীবনানন্দীয় প্রকৃতির আভাস পাই :

হেমন্তের হিম মাঠে আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় উড়ে।
হয়তো শুনেছ তারে'—তার সুর,—দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে,—জল-ডাহুকীর বুকে পউষ-নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পূবালি হাওয়ায় !

জীবনানন্দের কবিতার যে রোমান্টিকতা, তা রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিকতা থেকে ভিন্নতর। রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ জীবনানন্দের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন সেখানে চিত্ররূপকল্পনা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পরচনা মুখ্য সাধনা নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত সম্ভাব্য সুন্দর-অসুন্দর অনুভূতি থেকে উদ্ভূত চেতনাই বড়ো কথা। এই বিস্তীর্ণ অনুভূতিপ্রচয়-জাত চেতনা (sensibility) জীবনানন্দ-কাব্যের মুখ্য বিষয় আর কবির অস্তিত্ব ও এই নব চেতনার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। কবিতার রস কল্পনানির্ভর বা বুদ্ধিনির্ভর নয়, তা "এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিষ"—কবিতার এই নোতুন ব্যাখ্যা ও তার কাব্যরূপ জীবনানন্দ দিয়ে গেলেন। এখানেই তিনি বিশিষ্ট। আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সম্ভাবনাময় প্রভাববিস্তারকারী কবি তিনিই। সে-কারণে জীবনানন্দে আধুনিক কবিতার একটি নোতুন অধ্যায়ের সূচনা, এ-কথা হয়ত অত্যুক্তি নয়।

আর যে দুই প্রধান আধুনিক কবির নাম স্মর্তব্য—তাঁরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর কবিরূপেই এঁদের আগমন—মননপ্রধান

বুদ্ধিনিষ্ঠ তর্কসংকুল কবিতার প্রবর্তকরূপে এঁরা স্মর্তব্য। সুধীন্দ্রনাথের খ্যাতি দার্শনিক কবিরূপে, বিষ্ণু দে-র খ্যাতি বুদ্ধিমান কবিতা-রচয়িতারূপে। য়ুরোপীয় কাব্যভাবনার সার্থক প্রকাশ বাংলা কবিতায় প্রথম এঁদের কাব্যে দেখা গেল।

সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যে যে দার্শনিক সন্ন্যাসী কবির দেখা মিলল, তিনি বাংলা কাব্যে নানা কারণে স্মরণযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ যথার্থ ক্লাসিকাল্ কবি। ভাবের প্রগল্‌ভতা, ছন্দের চটক, শব্দের অপচয়ের তিনি বিরোধী, জনরুচির প্রসাদলাভে তাঁর একান্ত অনীহা, আভিধানিক ও অর্ধ-পরিচিত তৎসম শব্দের প্রতি ঝোঁক, বক্তব্যপ্রকাশে সংযম ও হৃদয়াবেগের কঠিন শাসন সুধীন্দ্রনাথকে এমন একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে, যা সহস্রের ভীড়েও কখনো দৃষ্টি এড়ায় না। বিষ্ণু দে ও কিছু পরে অমিয় চক্রবর্তী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সুধীন্দ্রনাথের পথেই এগিয়েছেন এবং মননপ্রধান জীবনজিজ্ঞাসানিষ্ঠ কবিতা রচনা ক'রে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আধুনিক কবিতার নেতৃস্থানীয় কবিরা রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা, সংশয় ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধ (১৯৩৪) [সাহিত্যের স্বরূপ] ও 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ (১৯৩২) [সাহিত্যের পথে] রবীন্দ্রনাথের সংশয়ের পরিচয়স্থল। এই দুটি প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আগেই উদ্ধার করেছি। 'আধুনিক বাংলা' কবিতা যে 'শাশ্বতভাবে আধুনিকে'র বিরোধী নয়, তার প্রমাণ একালের কবিতায় পাওয়া যাবে। এখানেই আধুনিক বাংলা কবিতার সার্থকতা। এখানেই পরিশেষ-পুনশ্চ কাব্যের নোতুন কাব্যভাবনা ফলবতী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা

॥ ১ ॥

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'প্রতিভার স্ফূর্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহূর্তের উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুইজনে চোখাচোখি হইল, ভালবাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল।'

প্রেমের এই মাহেন্দ্রক্ষণের উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের স্বরূপ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পটভূমিতে কেবল বৈষ্ণব প্রেমদর্শন নয়, সেই সঙ্গে প্লেটো ও শেলীর প্রেমচিন্তাও বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনার অন্তর্ভুক্ত দুটি গদ্যপুস্তক 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৫) এই প্রসঙ্গে অবশ্যস্মর্তব্য।

মানবসংসারের মধ্যে প্রবেশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুটি গ্রন্থে প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করেন। 'কবিকাহিনী'তে (১৮৭৮) রবীন্দ্র-প্রতিভার যাত্রা শুরু হয়। তারপর 'বনফুল' (১৮৮০), 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩)—এই ক'টি কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে প্রকাশিত গদ্যরচনা হল—'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস (১৮৮৩), 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩)। তারপর 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী', 'শৈশবসঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), তারপর 'রবিচ্ছায়া' (সংগীত সংগ্রহ) (১৮৮৫) ও 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। এরই মাঝে গদ্যরচনা—'রামমোহন রায়' ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)। 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) থেকে 'কড়ি ও কোমল'

(১৮৮৬)—এই পর্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের পূর্বেই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন (sublimation)-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলিতে—নাটকে, কাব্যে ও গদ্যালোচনায়। আর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রেমের যে বিশিষ্ট রূপটি বাইশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ ধ্যান করেছিলেন, পরবর্তী সুদীর্ঘকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে তারই বিস্তার। মূল বক্তব্য ঐ গ্রন্থেই পাই, বাইশ বছরের তরুণ কবির কণ্ঠে ভোগাসক্তিমুক্ত প্রেমের যে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে তা-ই বিচিত্র রাগিণীতে বেজে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৩-র ডিসেম্বরে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। তার আগেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। কয়েকমাসের মধ্যে কবিজীবনে প্রেরণাদাত্রী দেবীসমা বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর 'আত্মহনন' (মৃত্যু) হলো (মে, ১৮৮৪)। এর প্রতিক্রিয়ায় বেরুল, ভারতীতে 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)। এখন আর একথা বলা যাবেনা 'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।' বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংসার ও জীবনকে কবি নোতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই মৃত্যুতে প্রেমের অবিনশ্বরতার উপলব্ধি ঘটল। জীবনস্মৃতিতে তারই স্বীকৃতি :

'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্ত যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।'

পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর পটভূমিতে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে' তারই সূচনা—প্রিয়বিয়োগের দুঃসহ শোকের মাঝে জীবনের তথা প্রেমের গভীর উপলব্ধি :

> ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ,
> জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
> অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ
> যত দেয় তত পায়। কিছুতে না হয় অবসান। ('চিরদিন')

॥ ২ ॥

'বিবিধ প্রসঙ্গে' ভালোবাসার 'অনধিকার স্বত্ব' ও মৃত্যুহীন মোহহীন চিরন্তন ভালোবাসার রূপটি ধরা পড়েছে। ভালোবাসা মূলতঃ গ্রহণ নয়, ত্যাগ ; সংগ্রহ নয়, নিজেকে বিতরণ, ভোগাসক্তির বন্ধন নয়, ভোগাসক্তির উর্ধ্বায়ন। 'আলোচনা'র কবির বক্তব্য—প্রেমেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা—প্রেমের সার্থকতা লোভে নয়, দানে ; ক্ষুদ্রতায় নয়, ভূমায় ; অধিকারে নয়, অনধিকারে। সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের যে বিচিত্র রূপ আমাদের সামনে প্রকাশিত, তা'তে একথাই নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া নোতুন কোনো কথা নেই। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তার বীজগ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা'।

সুধী সমালোচক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে যা বলেছেন, তা পুনঃস্মরণযোগ্য :

"'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হবার আগেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'আলোচনা'র লেখাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সত্য স্বীকার করেছিলেন এবং প্রেমের সর্বব্যাপকতার প্রেরণায় তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে দেশাত্মবোধ,—দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বানুভূতি,—বিশ্বানুভূতির সঙ্গে শিল্পিচেতনা এবং শিল্পিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনা একই পুটপাকে পাক হয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, অখণ্ড, অবিভাজ্য এক সত্যবোধে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রমানসের এই বিশেষ প্রকৃতিটি পর্যালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবিমিশ্র 'প্রেমের কবিতা' বলতে যা বোঝায়, সে পদার্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। তাঁর অনুভূতিতে প্রেম একটি ধাতুসঙ্করের (alloy) মতো। দেশ, সমাজ, বিশ্ব, ঈশ্বর—ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা তাঁর শৃঙ্গার-চেতনার চৌহদ্দীর বাইরে অবান্তরবোধে বহিষ্কৃত হয় নি। 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্বেই প্রেমের ধারণার সঙ্গে এই সব ধারণার পরমাণবিক অন্তরঙ্গতার (affinity) ফলে রবীন্দ্রমানসের শৃঙ্গারচেতনা বিশিষ্ট এক যৌগিক প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়েছিল।" ['সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি']

এখন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলি স্মরণ করা যেতে পারে।

(ক) ' 'ভালবাসা' অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে,

হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।

......প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয়-মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুরে আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়।

......একে ত যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভাল জিনিস দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিস দিলে মন্দ জিনিসের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

......সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শভাবের চর্চা হইতে থাকে।...... ভালবাসা অর্থে ভাল বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপনা করা।'

[মনের বাগান বাড়ি, বিবিধ প্রসঙ্গ]

(খ) 'প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাহার ধর্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্দমবৃত্তি বলে। কর্দমে একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বের স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেন না দাসত্ববিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে

দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালবাসা নিপাত যাক।' [আদর্শ প্রেম, তদেব]

(গ) 'অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য সম্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায় অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্য জীবন।' [আত্মসংসর্গ, তদেব]

(ঘ) 'একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

......জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্মবিরুদ্ধ।' [ধর্ম, আলোচনা]

(ঙ) 'সৌন্দর্য উদ্রেক করিবার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অবচেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

অতএব কবিদিগকে আর কিছু করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

......যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে; তাহার আদ্যোপান্ত প্রেমের সূত্রে গাঁথা; তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই।' [সৌন্দর্য ও প্রেম, তদেব]

(চ) 'প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা।......স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার

ভিতরকার ভাব, তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের সকল লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন।'

[ডুব দেওয়া, তদেব]

॥ ৩ ॥

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি এ'কথাই প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ভালবাসার দেবতা স্বভাবসন্ন্যাসী। আসক্তি থেকে অনাসক্তিতে, ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়, সংকীর্ণ থেকে বৃহতে তার গতি। এই গতি-ই জীবন, গতি-ই প্রেম। এই গতি সর্বদা ঊর্ধ্বায়নের (sublimation) পথে। প্রেমে সৌন্দর্য, প্রেমে ব্যাপ্তি, প্রেমে সামঞ্জস্য। প্রেমের অধিকার মানে বৈষয়িক অধিকার নয়, হৃদয়ের অধিকার, স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকার নয়, দানের অধিকার। প্রেমের দিব্যবিভায় জগৎ উদ্ভাসিত। প্রেমসাধনার গতি যে ঊর্ধ্বগামী, তা যে আত্মবিসর্জনোন্মুখ, মুক্তিকামী, তা যে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত উদ্‌যাপনেই মুক্তি পায়, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে তা বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রেমের দ্বারা লভ্য, জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা অংশই লভ্য, তাই প্রেমই সবসাধ্যসার। এই প্রত্যয়ের আলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে প্রেমের বন্দনা করেছেন। 'আলোচনা' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংএর Inclusions কবিতাটি উদ্ধার করে এই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমের যে মিলন তা আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, অংশের সঙ্গে অংশের মিলন নয়, সম্পূর্ণের মিলনোপলব্ধি :

Oh, must thou have my soul, Dear,
Commingled with thy soul,—
Red grows the cheek, and warm the
Hand,......the part is in the whole !
Nor hands nor cheeks keep separate,
When soul is joined to soul.

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা এই আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের মহৎ ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত। 'প্রেম নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজীবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন' ('পঞ্চভূত'); 'ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয়

না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায় না' [প্রেম, 'শান্তিনিকেতন']; 'ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখস্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছা পূরণ ও আত্ম-পরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই' ('চিঠিপত্র', ১), 'প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে, রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে' ('মহুয়া'র কবিকৃত ভূমিকা), 'প্রকৃতি যখন প্রেমের সারথ্য নেয় তখন সে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম যখন তার চালক হয় তখন সে প্রেম মুক্ত রূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তিশান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরম সুন্দর।' (ভারতবর্ষীয় বিবাহ, 'সমাজ')—যদৃচ্ছা উদ্ধৃত এই মন্তব্যগুলি উপরিধৃত অভিমতকেই সমর্থন করে।

আবার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রেম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নিজস্ব বক্তব্যকেই নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। বাসনার আগ্নেয় আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ না প্রথম জীবনে, না উত্তর জীবনে—কখনোই সমর্থন করেন নি।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লেখেন :

'দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্র কারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।' [প্রাচীন সাহিত্য]

পঁচিশ বছর আগে লেখা 'মনের বাগান বাড়ি' রচনায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) এই বক্তব্যই বাইশ বছরের তরুণ যুবক উচ্চারণ করেছিলেন। আজ পঞ্চাশের উপান্তে উপনীত প্রভায়-অভিজ্ঞতা-খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত কবি সেই একই কথা বললেন।

নারীর মধ্যে প্রেমের প্রবর্তনাকে এই দৃষ্টিতেই দেখে কবি 'সমাজ' (১৯০৮) গ্রন্থে যে-কথা বলেছেন, তা 'প্রাচীন সাহিত্যে'র বক্তব্যের পরিপূরক :

'নারীর দুটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে ·····মানব সংসারে তা পাপকে, অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে।' [ভারতবর্ষীয় বিবাহ, 'সমাজ']

আবার সত্তর-উপান্তে উপনীত কবি প্রেমের কল্যাণীরূপের—আত্মদান রূপের—ত্যাগরূপের বন্দনা করে লিখলেন 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে (১৯২৯)—

'নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর, না, বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।'

[পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, 'যাত্রী']

'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) থেকে 'যাত্রী' (১৯২৯)—প্রায় অর্ধ-শতাব্দী সময়সীমার মধ্যে রচিত গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তার মূল বক্তব্য একই রয়েছে। রবীন্দ্রকাব্য উপন্যাস নাটকে এই সত্যের ব্যত্যয় হয় নি। 'মহুয়া'র 'মায়া' কবিতাটি এই সত্যেরই সংহত রূপ।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের শেষ চল্লিশ বছর ও বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের সার্বিক নব জাগরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নব জাগরণে তাঁরও একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন দেশপ্রেমের কথা এদেশে উচ্চারিত হয় নি। তাঁর বাল্য ও কৈশোরে হিন্দুমেলা ও কংগ্রেস ও যৌবনে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী মেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞা, সাধনা ও কর্মযোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ-সবের মধ্যেই তাঁর নিশ্চিত ভূমিকা ছিল। তিনি সত্তর-উপান্তে পৌঁছে ঘোষণা করেছেন, "যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ-কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।' [আত্মপরিচয়, ৫]। জীবনকে প্রবলরূপে গ্রহণ করার সদা-উৎসুক্য ও আগ্রহ এই ঘোষণায় স্পষ্ট-উচ্চারিত হয়েছে। জীর্ণ ও পুরাতনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য ছিল না, তাঁর আনুগত্য নবীন ও তারুণ্যের প্রতি। এ-কথাই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি জান আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীতকালে আড়ষ্টভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে, একথা আমি মানি নে।" [কংগ্রেস, কালান্তর]। প্রথম উক্তি ১৩০৮ বঙ্গাব্দের, দ্বিতীয়টি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের—অর্থাৎ জীবনের শেষ দশ বছরের পর্বে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় প্রবীণ মনীষীর মন কতটা সজাগ ও নবীন ছিল।

'সাধনা' পত্রিকার যুগ থেকে 'সভ্যতার সংকট' ভাষণ পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা এই পঞ্চাশ বছরের ইংরেজি ও বাংলা রচনায় ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি

রচনা 'Nationalism' (১৯১৭) ও শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা 'কালান্তর' (১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক মতামত এই দুটি গ্রন্থ ও অন্যান্য বাংলা গ্রন্থে ['রাজা-প্রজা' ১৯০৮, 'সমূহ' ১৯০৮, 'স্বদেশ' ১৯০৮, 'সমাজ' ১৯০৮, 'রাশিয়ার চিঠি' ১৯৩১] গ্রথিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রবলরূপে বেঁচেছিলেন, সে-কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা অচল অনড় নয়। এবিষয়ে তিনি নিজেই আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।......রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য কোন অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে তাকে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।" ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর] এই সতর্কবাণী স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত-বিচারে অসুবিধা অনেক। পরস্পর-বিরোধী উক্তি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থন তিনি করেছেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, তিনি ইংরেজ শাসনকে একান্তভাবে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করেছেন। ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের সংযোগ যেমন তাঁর কাছে মঙ্গলকর মনে হয়েছে তেমনি ইয়োরোপ আমাদের জীবনে ক্ষতিকর বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-দৃষ্টিকে অভ্যর্থনা করেছেন, আবার প্রাচীন ভারতের তপোবনকেন্দ্রিক সভ্যতাকে আদর্শ বলে মনে করেছেন। এইভাবেই তাঁকে সমাজতন্ত্রের-সমর্থক ও বিরোধী, জাতীয়তাবাদী ও জাতীয়তাবিরোধী রূপে দেখানো সম্ভবপর। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন 'It is said that Rabindranath's song has been the inspiration to anarchist activities.........Strange to say, the opposite

view prevails in some quarters in India, where it is urged that Rabindranath has given up his old nationalist attitude. ('The Philosophy of Rabindranath Tagore')। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে যথাক্রমে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আবার তাঁর গানের মধ্যে দেশমাতৃকার বন্দনা যা আমরা পেয়েছি, তা আমাদের প্রেরণা দিয়েছে।

'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল,' 'নমো-নমো নম, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রমুখ গানে বাঙালি দেশকর্মীমাত্রেই প্রেরণা পেয়েছেন, আবার 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানকে রাষ্ট্রীয় সংগীতরূপে নির্বাচনের পিছনে এই প্রেরণাই ক্রিয়াশীল। তাই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত-বিচারে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তামূলক রচনা ধীরভাবে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর কাছে 'স্বরাজ' বিশিষ্ট অর্থে প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ করাটাই তাঁর কাছে দেশপ্রেমের চরম প্রকাশ বলে কখনো মনে হয় নি। তাই এ'কথা বলেছেন, "যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এসব কথা শোনবার যোগ্য নয়। ...আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যে দিন স্বরাজ হাতে

আসবে তার পর দিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।" ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

আমাদের আত্মপ্রতারণার চমৎকার বিশ্লেষণ এখানে পাই। স্বাধীনতার চোদ্দ বছর পরে আজ উপযোক্ত মন্তব্য বর্ণে-বর্ণে মিলে যাচ্ছে। গত শতকের শেষে নরমপন্থীদের (কংগ্রেসের মডারেট দল) ভিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, "তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে' গবর্নমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গর্ব করতেম।" (তদেব)

স্বরাজের স্বরূপ কী—এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে বলেছেন, "দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। ...স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো-আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এ রকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়। স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।...সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।"

[স্বরাজসাধন, কালান্তর]

স্বরাজলাভের পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে :

"আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হচ্ছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব

চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমৎলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালো মানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই দেখে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না—চীৎকার করে মা বলে', দেবী বলে', মন্ত্র পড়ে' যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়—তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ এই-রকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি।"

বিলাতিদ্রব্য বর্জন ও চরকা প্রচলন, সম্মোহন মন্ত্র ও গুরু আরাধনা স্বরাজলাভের পথ নয়: নির্ভীক ভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রচার করেছেন। আসল কথা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। অসহযোগ আন্দোলন মূলতঃ নেতিমূলক আন্দোলন বলে রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেন নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার তিনি বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে :

"শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদের ঐক্যদান করিবে।......একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এদেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি ত এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিব।" ['ভারতী, ১৩১৫']

আর স্বরাজলাভের জন্য যুক্তির নির্বাসন, দেশের চিত্তশক্তির সাময়িক অবরোধ, গুরুপদে আত্মসমর্পণ, গুরুবাক্য ওরফে দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপনের তীব্র নিন্দা রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে।

॥ ৩ ॥

ভারতের স্বাধীনতার দাবী রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। বলা চলে, স্বাধীনতাকামী ভারতের আত্মা তাঁর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, হিজলী বন্দীশিবিরে গুলিচালনার প্রতিবাদে, মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাবে দৃপ্ত উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ বারবার গর্জন করে উঠেছিল।

স্বাধীনতার আহ্বান যখন রবীন্দ্রকণ্ঠে শুনি, তখন সমস্ত মন জেগে ওঠে। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন,

"আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই, এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই। ...ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয় যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো।" [কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কালান্তর]

আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমাদের চাই—এই কথাটাই বার বার রবীন্দ্রনাথ সবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে" রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনপথে বেরিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ-শাসন তথা শোষণের তীব্র সমালোচনা করে অন্তিম ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।" [সভ্যতার সংকট]

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অত্যাসন্ন, তা রবীন্দ্রনাথ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরেজকে

এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ সভ্যতার এই দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" [তদেব]

পরাধীনতার বেদনা ও শোষণের নিন্দা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষের মুক্তি, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব বিশ্বাস।

॥ ৪ ॥

স্বাধীনতার স্বরূপ-বিচারেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি; ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন। অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন জীবনের চরম স্বাতন্ত্র্যবাদকে তিনি স্বীকার করেন নি। পিটার ক্রপটকিন Anarchy বা নৈরাজ্যবাদকে রাষ্ট্রসাধনার চরম বলে মনে করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমোৎকর্ষ এই মতবাদের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই মত গ্রাহ্য করেন না, তাঁর ধারণা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভবপর। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ যে হিবার্ট-বক্তৃতা দেন, তা 'The Religion of Man' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন,

"It is true that in the human world only a perfect arrangement of inter dependence gives rise to freedom. The most individualistic of human beings who own no responsibility are the savages who fail to attain their fullness of manifestation.··· The history of the growth of freedom is the history of perfection of human relationship."

পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের উন্নতিই ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশের অনুকূল বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা।

রাষ্ট্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি রাষ্ট্রবিরোধী। এ বিষয়ে তিনি হেগেলের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত

পোষণ করেন। হেগেল তাঁর 'The Philosophy of Right' গ্রন্থে বলেছেন, রাষ্ট্রই ব্যক্তির জীবনের চরম বিকাশের একমাত্র উপায় এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিজীবন অসম্ভব; আর সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে রাষ্ট্রকেই মেনে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ঠিক বিপরীত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা।......এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপরে যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্র-তন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত। পাশ্চাত্ত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে।"

['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর]

॥ ৫ ॥

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে মুখ্য করা হয়েছে বলেই ভারতের দুর্দশা। এই দুর্দশার নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বস্তুতঃ এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের চেহারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর কথাই উদ্ধার করি:

"এই তো গেল আমাদের সব চেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে

হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করার সমস্যা......আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।"

[সমস্যা, কালান্তর]

আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রিয় জীবনে এর বাইরে আর কোনো সমস্যা নেই। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আলোকে এই সমস্যাগুলির চেহারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার গোঁজামিল দেবার যে চেষ্টা হয়েছে—অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ সমর্থন, ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার লজ্জাকর হীনতা—সে-সবের মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে, তা 'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, "আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না।" (তদেব)। "ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা" ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের এইসব বিশ্লেষণ অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পথ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে।" (তদেব)। এই ভূত আমাদের জীবনে এনেছে ভেদ ও পরবশতা, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের আয়ুধ হোক শুভবুদ্ধি—যা অনৈক্যের অশিক্ষার নীচতার ও লোভের বিরুদ্ধে।

চিত্তশক্তির দৈন্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে দেশে বিস্তীর্ণ করে দিলেই দেশের মুক্তি—তাঁর এই পন্থা তিনি 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রজীবনে যখনি দেউলে চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, তখনি তার বিরুদ্ধে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, নির্ভয়ে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের এটাই সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেছেন, "আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা

চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।"
[রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর]

আসল কথা, স্বরাজের প্রধান শর্ত আত্মশক্তির উদ্বোধন। 'স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তারপরে, এমন কথাও তেমনিই সত্তাহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।' (তদেব)

দেশের চিত্তশক্তির দৈন্যের তীব্র নিন্দা করে নির্ভয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ভর্ৎসনা-বাক্য উচ্চারণ করেছেন :

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আবর্তন হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন; সে কি এই চরকা চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণই কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তরপ্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে? স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?" (তদেব)

এই ধিক্কারের প্রয়োজন আজো ফুরোয় নি।

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমর্থনে তাঁর বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতা ও বিখ্যাত 'রাশিয়ার চিঠি' ভ্রমণগ্রন্থ প্রথমেই স্মরণে আসে। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন, রাশিয়ায় না এলে তাঁর "এযুগের তীর্থদর্শন" বাকি

থেকে যেত। ইতালি ভ্রমণকালে (১৯২৬) তিনি প্রকাশ্যে মুসোলিনির ব্যক্তিত্ব ও কর্মাবলীর প্রশংসা করেছিলেন। তবে কি ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ বা 'সর্বহারার একনায়কত্বে'র সমর্থক? এর স্পষ্ট উত্তর—না। ইতালি ভ্রমণান্তে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিলেনুভেতে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ইতালিতে মুসোলিনির দল তাঁকে ঠকিয়েছে, ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থা তিনি দেখতে পান নি, বুঝতে পারেন নি ফ্যাসিবাদের গোপন রূপকে। তখনই তিনি ইংলণ্ডের 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে' এক পত্রে ইতালি ও মুসোলিনি সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত লিখে পাঠালেন। এক ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন। এই পত্রে তিনি সি. এফ্. এনড্রুজকে লিখেছেন :

"It is absurd to imagine that I could ever support a movement (meaning Fascism) which ruthlessly suppresses freedom of expression, expresses observances that are against individual conscience, and walks through a blood-stained path of violence." [vide—Visva-Bharati Quarterly, October, 1936]

আর সোবিয়েৎ দেশে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' তথা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলুপ্তি? রবীন্দ্রনাথ কি 'রাশিয়ার চিঠি'তে তা সমর্থন করেছেন? তিনি বলেছেন :

"মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা ঠিক ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিষ্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মত ভাল ফল দিতেও পারে কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। ......মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবী করবেই।" (রাশিয়ার চিঠি)

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এই উক্তি সম্প্রতিকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্বের রদবদল তারই প্রমাণ।

অপর প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ কি সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক ছিলেন? মতবাদগতভাবে তিনি সমাজবাদী ছিলেন, এ'কথা বলা উচিত হবে না। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' নাটক-নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই সমাজ-চেতনার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরোহিততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবী আজ শূদ্রের হাতে এসেছে, তারাই আগামী পৃথিবীর নায়ক—'রথের রশি' নাটিকায় তারই ইঙ্গিত পাই। আর পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-প্রান্তিক-সেঁজুতি-নবজাতক-সানাই কাব্যধারায় মানবতার মহিমা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'ঐকতান', 'আফ্রিকা', 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ'—রবীন্দ্রনাথের মানবচিন্তার পথে এক একটি অগ্রবর্তী প্রদীপ।

শ্রমজীবী মানুষের শোষণের রূপটি রবীন্দ্রনাথের দরদী লেখনীতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে :

"মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা, সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। উপরে সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

('প্রবাসী', ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)

সাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদ এখানে লক্ষ্য করা যায়। মানবমহিমার সর্বশেষ মন্ত্রটি কবি উচ্চারণ করেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে

আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

(পত্রপুট)

মানবতাবোধের মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ এখানে জয়মাল্য দিয়েছেন।

॥ ৭ ॥

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার শেষ বিচার্য বিষয়—তিনি জাতীয়তাবাদকে কী ভাবে গ্রহণ করেছেন?

রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে মানবতার বন্দনা, রাষ্ট্রচিন্তায় তারই অভ্যর্থনা। কবিকণ্ঠে মানবসংসারের বন্দনা:

আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি। (জন্মদিনে)

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের উপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই দিয়েছেন আন্তর্জাতিকতাবাদকে। তিনি বলেছেন:

"বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যে দিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐহিক মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।" [চরকা, কালান্তর]

আন্তর্জাতিকতার কোন্ রূপ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল, তার সামান্য পরিচয় এখানে পাই। এই "অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাপথে

বাধা জাতীয়তাবাদ, তাই তা বর্জনীয় বলে তিনি মনে করেন। 'ন্যাশন্যালিজম' বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য সাধনা, পশ্চিমের কাছ থেকেই আমরা তা পেয়েছি তিনি মনে করেন :

"স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।"

('বাংলা ভাষা পরিচয়', পৃ. ৬৮)

আরো স্পষ্ট করে বলেছেন 'Nationalism' ভাষণমালায়—

India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them a country is greater than the ideals of humanity.

বিশ্বমানবত্ব জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমের চেয়ে বড়, এই শিক্ষাই ভারতবাসী গ্রহণ করুক : রবীন্দ্রনাথের এই অভিলাষে উদার আন্তর্জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

যুগন্ধর মনীষী গেটের সেই মহৎ উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আস্থা ছিল বলেই মনে হয়, যেখানে গেটে বলেছেন,

"মানুষ ও নাগরিক রূপে কবি তাঁর নিজের দেশকে ভালবাসবেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও প্রতিভার স্বদেশ রয়েছে সত্তা, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের জগতে —এই দেশের কোনো সীমান্ত নেই" (the poet as a man and citizen will love his native land, but the native land of his genius lies in the world of goodness, greatness and beauty, a country without frontiers or boundaries)।

জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও অহমিকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। 'Nationalism' গ্রন্থে পশ্চিমী ও জাপানী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের তীব্র নিন্দা তিনি করেছেন, কারণ তা "গুণ্ডাদের ভ্রাতৃ-সঙ্ঘমাত্র" (brotherhood of hooligans), কারণ

এর দ্বারা মানুষকে শৈশব থেকে ঘৃণা ও সর্বপ্রকার প্রলোভনে দীক্ষিত করা হয়—অর্ধসত্য ও অসত্য ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়, এতে স্বার্থপরতার প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সকল মহৎ আদর্শের বিসর্জন দেওয়া হয়. ('Where the spirit of Western Nationalism prevails, the whole people is being taught from boyhood to foster hatreds and ambitions by all kinds of means—by the manufacture of half-truths and untruths in history, by persistent misrepresentation of other races and the culture of unfavourable sentiments towards them, by setting up memorials of events, very often false, which for the sake of humanity should be speedily forgotten, thus continually brewing evil menace towards neighbours and nations other than their own. This is poisoning the very fountainhead of humanity. It is discrediting the ideals, which were born of the lives of men who were our greatest and best. It is holding up gigantic selfishness as the universal religion for all nations of the world')

পাশ্চমী জাতীয়তাবাদের কুফল দেখিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, জাপান যখন একে গ্রহণ করেছে, তার নিন্দা করেছেন। জাপানী কবি ইয়োন নোগুচির পত্রের উত্তরে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৯৩৮) তার পরিচয়স্থল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'জাতীয়তার চেয়ে অনেক বড়ো মানবতা' ('humanity is greater than nationality')।

রবীন্দ্রনাথ 'Nationalism' গ্রন্থে যে মূল্যবান রাষ্ট্রচিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে আজও আমরা উপকৃত হতে পারি। উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের সৃষ্টি। জাতি-ধারণা মানুষকে যুদ্ধ ও মুনাফালুটের যন্ত্রে পরিণত করেছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

("The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creations of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-

making puppets, ludicrously vain of their pitiful perfection of mechanism.")

রোমাঁ রলাঁ ও হ্যারল্ড ল্যাস্কি অনুরূপ উক্তিই তাঁদের লেখায় করেছেন ('Rolland and Tagore' এবং Laski's 'Nationalism and the future of civilisation' দ্রষ্টব্য)।

পশ্চিমের যন্ত্র সভ্যতা যুদ্ধের কালো ছায়া ফেলছে পৃথিবীর উপর— দ্বিতীয় বিশ্বসমরের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ তা বারবার ঘোষণা করেছেন। 'প্রান্তিক', 'শেষ সপ্তক', 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থে তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এবং এই সর্বনাশা আত্মঘাতী মূঢ় অপব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পৃথিবীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। স্বার্থপর হিংস্র জাতীয়তাবাদ বা নিষ্প্রাণ ধোঁয়াটে আন্তর্জাতিকতা—কোনোটার দ্বারাই মানবজাতির কল্যাণ হবে না বলেই তিনি মনে করেন ("Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of national worship is the goal of human history.")। তবে কোথায় মানুষের মুক্তি? কি তাঁর আদর্শ? লক্ষ্য তাঁর কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—ব্যক্তির মধ্যে মহামানবের প্রাণ-শক্তির, বিশ্বমানবতার অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন ('My religion is in the reconciliation of the Super-Personal Man, the universal human spirit, in my own individual being.' : আইনস্টাইনের সঙ্গে কথোপকথন, জুলাই ১৯৩০)। ব্যক্তি, জাতি ও মানবতার পূর্ণ সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' ও 'The Religion of Man'-গ্রন্থে মানবধর্মের সেই শ্রেয় পথের নির্দেশ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও হিংস্র বর্বরতার এবং কুবেরের সর্বনাশা লক্ষ্মীমোহ ও মানুষকে মুনাফার যন্ত্ররূপে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। দুটি কবিতা এখানে স্মর্তব্য : 'প্রশ্ন' ও 'আফ্রিকা'।

যুদ্ধবাদী মারণাস্ত্রব্যবহারকারীদের তীব্র নিন্দা করে ঈশ্বর-সমীপে রবীন্দ্রনাথ এই 'প্রশ্ন' উত্থাপন করেছেন :

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'

আর ছায়াবৃতা উপেক্ষিতা আফ্রিকার উদ্দেশে বলেছেন, পশ্চি[illegible] লোভী শক্তির প্রতিনিধি বাহক আর সৈনিকের দলই তার [illegible] কারণ—

'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের [illegible]।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।'

রক্তে অশ্রুতে মিশে আফ্রিকার ধূলি হল পঙ্কিল, অরণ্যপথ হল ক্রন্দনে বাষ্পাকুল আর—

'দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।'

অপমানিতা আফ্রিকার প্রতি মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন দরদ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সেই উপেক্ষিতা আফ্রিকার আজ নবজাগরণ ঘটেছে, অপমানিত মানবতা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই অসহ্য অত্যাচার, উপেক্ষা আর অপমানের পরিবর্তে বর্বর হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের কাছে কোন্ উপহার অপমানিতা এশিয়া-আফ্রিকা নিয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে কবি 'আফ্রিকা' কবিতায় (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) শেষে বলেছেন :

'এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।'

'সভ্যতার সংকট' (১ বৈশাখ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম ভাষণ। এখানে তিনি প্রফেটের মতো আধুনিক সভ্যতার বিচার ক[illegible] করেছেন—'মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার [illegible]

[illegible] হয়ে উঠেছে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে'। নিষ্ঠুর ইংরেজ সাম্রাজ্য-শক্তি যে ভারতবর্ষকে দুর্বিষহ নিষ্ফলতার বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা করে রেখে যাবে, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ভর্ৎসনা উচ্চারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তাঁর মর্মবেদনা কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষের জন্য নয়, প্রাচীর জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য— মানবতার জন্য।

এই অন্তিম ভাষণের শেষাংশে মানবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।......কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।...... মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রাষ্ট্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের এই পরাভবহীন বিশ্বাস ও আস্থা সবচেয়ে বড়ো দান।

রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান কি? এই প্রশ্নের বিচারে আমাদের স্বীকার করতে হয়, সত্য ও প্রেমের আদর্শ বুদ্ধ ও খৃষ্টের কাছ থেকে জগৎ পেয়েছে; বিশ্বমানবতার ভাবধারা কঁৎ, গোটে পূর্বেই প্রচার করেছেন; সমন্বয়ের ধারণা রামমোহনের কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিরোধী। রাষ্ট্রবিরোধী নৈরাজ্যবাদ ক্রপটকিন, বাকুনিন, টলস্টয় পূর্বেই প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকেই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করেছেন, তিনি রাষ্ট্রবিরোধী সমাজে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান প্রধানত তিনটি। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির উদ্বোধন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বা নেতিবাচক চরকা-আন্দোলনে আমরা যথার্থ মুক্তি পাব না বলেই তিনি মনে করেন। এ-কারণে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ও

মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরোধিতা করতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও অহংকারতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর জন্য দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিদেশে রাষ্ট্রপতি উইলসনের বিরোধিতা করেছেন। জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি। জাপানে, আমেরিকায়, জার্মানিতে এজন্য তিনি যে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন, তাতে দমিত হন নি। এই মত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করবে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই অভিযোগে তিনি কর্ণপাত করেন নি। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিকূল পরিবেশে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। সেদিন যা নিন্দিত হয়েছিল, আজ তা অভ্যর্থিত হয়েছে। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে 'মহামানবে'র আগমনকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন, সেই বিশ্বমানবতার পথেই রণক্লান্ত পৃথিবীর মুক্তি ঘটবে, আজ এ-কথা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা চিন্তাশীল মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

॥ ১ ॥

বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা (সতেরো খণ্ড, ১৯০৯-১৯১৬) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই উপদেশমালা গতানুগতিক ধর্মব্যাখ্যান নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ও রবীন্দ্রমানসের আন্তর-ভাষ্যও বটে। সেখানেই এর গুরুত্ব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। বিশ শতকের পৃথিবীর মনীষিবৃন্দের মধ্যে প্রথম সারিতে তাঁর আসন, তিনি আধুনিক যুগের প্রফেট, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে তিনি শান্তি ও মৈত্রীর পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছেন। আড়াই হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষ থেকেই করুণাঘন বুদ্ধদেব মুক্তিবাণী বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের মুক্তি-সাধনা তাঁর কাছে প্রেমসাধনা তথা মৈত্রীসাধনা বলে মনে হয়েছে। বুদ্ধদেব সম্পর্কে কবির দুটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। এক বৈশাখী পূর্ণিমার ভাষণে কবি বলেছেন, 'তাঁরই স্মরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষ-কে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।' অপর এক ভাষণে বলেছেন, "[আত্মার] সেই স্বরূপটি কী ? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।" (শান্তিনিকেতন ১, পৃঃ ২৯৫)।

এই করুণা, মৈত্রী ও নিখিল মানবের প্রতি বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা। এই বেদনাবোধ বুদ্ধদেবের ধর্ম ও বাল্মীকির কাব্যধারার উৎস। মহাকবির বেদনাবোধ এবং দার্শনিক-ধর্ম প্রবক্তার বেদনাবোধ অবশ্য এক জাতীয় নয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে

কাব্যসাধনা ও ধর্মসাধনাকে ভিন্ন করে দেখা যায় না, এ দুই একই অলৌকিক বেদনা-জাত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় তাই কবির ধর্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ অনিবার্যরূপে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের গভীর অধ্যাত্মব্যাকুলতা ও ঈশ্বরপ্রেম তাঁর সাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। আমাদের কথা এই যে, কোথাও তা শুষ্ক তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত হয়নি। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশ-মালা এর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দের অধিকারী, তা অলৌকিক আনন্দ। সেই আনন্দ-বাণীটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে সমস্ত জীবন ধরে মানসক্ষেত্রে ও সংসারক্ষেত্রে যে বেদনা বহন করতে হয়েছে, মৃত্যুশোক ও দুঃখের দ্বারা পীড়িত হতে হয়েছে, তার স্বাক্ষর রয়েছে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায়।

এই উপদেশমালার রচনাকাল ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। ঠিক তার আগে ১৯০২ থেকে ১৯০৭—এই ছয় বৎসর কবি-জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে "রবীন্দ্রনাথের জীবন কর্মের বিচিত্র উত্তেজনা এবং সাহিত্যের বিচিত্র রসসৃষ্টির মধ্যে কাটিলেও নিদারুণ শোকাঘাতে বারেবারেই তাহা খণ্ডিত ও নিষ্পেষিত হইয়াছে। কবিপ্রিয়া ও মধ্যমা কন্যার [রেণুকা] মৃত্যুর জন্য কবি বহুকাল হইতে অন্তরকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কারণ উভয়েই দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে দেহমুক্ত হন। কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু (১৩১৪, অগ্রহায়ণ ৭) কবির মনকে সত্যই রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়া-ছিল। শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর মাঘোৎসবে 'দুঃখ' নামে যে ভাষণটি দেন, তাহার মধ্যে বারে বারে কবির অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে। ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে শমীন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তারও কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ একই দিনে শমীন্দ্র-জননী স্বর্গত হন। তাই এই সময়ে কবির মনে শোকাঘাতজনিত নানা অধ্যাত্ম সমস্যা জাগিতেছে। মনের এই অবস্থায় শান্তিনিকেতনের মন্দির তোরণে প্রত্যুষান্ধকারে কবি ধ্যানে বসিতেন।" [রবীন্দ্র-জীবনী : দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৮৬-৮৭, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়]

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার পূর্বভাগে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনা, 'নৈবেদ্য' কাব্য ও 'ধর্ম' ও 'আত্মধর্ম' রচনা, উত্তরভাগে 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' ও

গীতালি'র গানের ধারা। নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানযোগী কঠিন সাধনা থেকে ব্যক্তিস্বরূপী রসসাধনায় উত্তরণ হয়েছে 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'তে। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা; কবির অন্তরে যে ধ্যানের প্রতিষ্ঠা, তা যে একান্ত সত্য ও বাস্তব, তার প্রমাণ এখানে পাই। কবির যে ধর্মজিজ্ঞাসা অধ্যাত্মব্যাকুলতা এই পর্বে রচিত 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ডাকঘর' নাটকচতুষ্টয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তারই ভিত্তিভূমি 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা। 'খেয়া' কাব্যে যে ঈশ্বর রহস্য-কুহেলি-আবৃত, তিনি গীতিধারায় ভক্তির আলোকে প্রকাশিত, তাঁর আসন পাতা হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসাকে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তার প্রমাণ পাই 'শান্তিনিকেতন'-এ। রবীন্দ্রনাথের আস্তিকতাকে বাদ দিলে রবীন্দ্র পদ্য-গদ্যের সকল প্রয়াসই যে ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য, একথা এখানে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করতে পারি।

নিদারুণ শোকের আঘাতে মৃত্যুর অভিঘাতে আরামের শয্যাতল-উত্থিত, কবিদের অন্তরের প্রকৃত মানসাহ্বান আকুল আত্মজিজ্ঞাসা 'শান্তিনিকেতন'-এর প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। দুঃখ, মৃত্যু, বেদনা যেমন আছে, তেমনই আছে সুখ, আনন্দ, হর্ষ, শুধু তাই নয়, দুঃখ ও বেদনা আছে বলেই সুখ ও আনন্দ আমাদের কাছে এত মধুর এবং সর্বোপরি বিশ্বনিয়ন্তা আছেন—তিনিই উৎসবরাজ। তাঁরই উৎসবে আমরা অংশীদারমাত্র, এই গভীর আত্মবিশ্বাসে 'শান্তিনিকেতন' প্রোজ্জ্বল।

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা কোনো বিচ্ছিন্ন মতবাদ নয়, তা রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনারই অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের এই সাধনার ভিত্তিমূল উপনিষদ ও তাঁর ঈশ্বর উপনিষদের ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথকে ও রবীন্দ্র-সাহিত্যকে জানতে হলে তাই আমাদের যেতে হয় উপনিষদের কাছে, ঋষিকণ্ঠ-উচ্চারিত মন্ত্রের ঔপনিষদিক ব্রহ্মের সমীপে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় ধর্মজিজ্ঞাসা বারবারই দেখা দিয়েছে। তার পরিচয় পাই—(১) রামমোহন রায়, ১৮৮৫, (২) ব্রহ্মোপনিষদ' ১৯০০, (৩) ব্রহ্মমন্ত্র, ১৯০১, (৪) ঔপনিষদ ব্রহ্ম, ১৯০১, (৫) ভারতবর্ষ, ১৯০৬, (৬) ধর্ম, ১৯০৯, (৭-২৩) শান্তিনিকেতন, ১৭ খণ্ড, ১৯০৯-১৬, (২৪) ধর্মের অধিকার, ১৯১২, (২৫) মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩, (২৬) ভারতপথিক রামমোহন

রাজ, ১৯০০, (২৭) আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ১৯৪১, প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থে এবং ব্রহ্মসংগীত, নৈবেদ্য, ১৯০১, গীতাঞ্জলি, ১৯১০, গীতিমাল্য, ১৯১৪, গীতালি, ১৯১৪ ও ধর্মসংগীত, ১৯১৪, প্রভৃতি কাব্য ও গীতিসংকলনে। [শ্রীসজনীকান্ত দাস-কৃত তালিকা, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১০৬৬]।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদভিত্তিক সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায়। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল শিল্পী ও সাহিত্যিক নন, তিনি যে প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ উপনিষদের ঋষি-কবিদের যোগ্য উত্তরসূরী, তার প্রমাণ এখানে পাই। শুধু তাই নয়, তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা যে তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার মূলেও বর্তমান, তার প্রমাণ এখানেই রয়েছে। ধর্মজিজ্ঞাসা-বিচ্যুত রবীন্দ্র-চর্চা ব্যর্থ, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। উপরোক্ত গদ্যগ্রন্থ, কাব্য, গীতি-সংকলন ও নাটকের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ভারত-সাধনারই ফল, নির্বিশেষ ধর্ম-জিজ্ঞাসারহিত সংস্কৃতি-সাধনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। পুনশ্চ, 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় এমন সব ভাষণ সংকলিত হয়েছে যার দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা সুগম ও সহজবোধ্য বলে প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসা তথা জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল বলে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। বর্তমান প্রবন্ধ এই গুরুত্বের স্বীকৃতি ও আলোচনা।

॥ ২ ॥

আশি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে মহতী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে ঔপনিষদিক শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করে বলেছিলেন, "আজ আমার আশি বছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি।··· আমি বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন······পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি, পশ্য দেবস্য কাব্যং, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার, তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়।"

আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে এসে, রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় যে কথা বলেছেন, শেষ জন্মদিনে উপরোক্ত কথায় তারই প্রতিধ্বনি শুনি।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নন, কোন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর নন, তিনি উপনিষদের উদার আকাশে স্বমহিমায় প্রকাশমান। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে তিনি ঐ উৎসবকে ব্রাহ্মোৎসব বলতে চান নি, 'ব্রহ্মোৎসব' আখ্যা দিয়েছিলেন। ধর্মজিজ্ঞাসায় এই সম্প্রদায়গণ্ডিমুক্ত ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসার প্রথম বৈশিষ্ট্য। কবি বলেছেন, "মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে! আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারপরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানি নে এটাও জানতে দেয় না।" (শান্তিনিকেতন ১, 'সংশয়', পৃঃ ৪)।

আমাদের ঈশ্বর সাধনা বা উপাসনার মধ্যে যে কত ফাঁকি আছে, তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতারণার তীব্র নিন্দা করেছেন। "মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তা কখনো আর ভোগ করতে পারবে না। সেইজন্যে সে যে জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও চিরদিনের মতো দেবার কথায় মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সবচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরা ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই হয়তো ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্বৃত্তের উদ্বৃত্ত। ঈশ্বরের নাম-গাথা দুটো একটা মাত্র পাঠ করা গেল, দুটি একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভাল বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম, বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে—আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।" (তদেব, 'মরণ', পৃঃ ২৬১)।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসা যে নিতান্তই বাস্তব, পরিচিত সংসারের মাঝেই যে কবি ঈশ্বরকে সন্ধান করেছেন, তার প্রমাণ এখানে পাই। কঠিন বাস্তবের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠিত, এজন্যই তা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দাবি করে। যখন পঞ্চাশোত্তীর্ণ কবিকে তাঁর ব্যক্তিগত সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুনি, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে এ অভিজ্ঞতা অনেক বেদনার মূল্যে ক্রীত। তাই একথায় আমাদের সায় দিতেই হয়—"সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ ভুলচ। ধর্ম-হীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চারদিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেবে যায়, তার কথা চিন্তা কাজ তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুময় হয়ে এসে তাকে বাজে। একথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি: না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে, তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে, নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে,—তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো। তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।" (তদেব, 'অভাব', পৃঃ ২৩৪-৩৫)।

রবীন্দ্রনাথ কেবল রসের সাধনা, ভাবের সাধনা করেছেন তা নয়, তিনি জ্ঞানের সাধনা, কঠিনের সাধনাও করেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে তার ইঙ্গিত আছে। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ভাবে গদগদ হয়ে ওঠাটা ক্ষতিকারক, একথা রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছেন 'ভাবুকতা ও পবিত্রতা' ভাষণটিতে। বলেছেন, "শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত স্তব্ধ হয়ে, দৃঢ় হয়ে,

গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে, নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে। শিকড়ের দিক থেকেই নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটি ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই। সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই—সেই-খানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। (তদেব, পৃঃ ১২৮-২৯)। সেই গভীর কঠিন শান্ত সংহত ধর্মপথেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে চালনা করেছেন।

প্রেমের সাধনায় এই বিকারের আশংকা সম্পর্কে আরেকটি ভাষণে কবি আলোচনা করেছেন। বলেছেন, "প্রেমের সাধনায় বিকারের আশংকা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিমুখ হই, জ্ঞানকে অমান্য করি। (তদেব, বিকারশংকা, পৃঃ ৪৭)।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাই কর্মের কঠোরতা ও জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে স্বীকার করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে বর্জন করে নয়। এইটি যদি আমরা স্বীকার করি তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা হতে মুক্ত হবো। ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনা আনে ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য। রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে চেয়েছেন ও বলেছেন সাধনার সার্থকতা সামঞ্জস্যে। (দ্রঃ 'রসের ধর্ম' ও 'সামঞ্জস্য' প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন ২)।

॥ ৩ ॥

জীবনে দুঃখকে কেবল স্বীকার করে নয়, তার মাহাত্ম্য কীর্তন করে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন। 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় বার বার তিনি একথা স্বীকার করেছেন।

দুঃখের মধ্য দিয়েই মঙ্গলময়ের আবির্ভাব ঘটে, এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে অন্যতম প্রধান বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, "দুঃখ এবং আঘাত

ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতি চেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। ......পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখ-কষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।" (শান্তিনিকেতন ১, 'দুঃখ', পৃঃ ১৮–১৯)

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আছে বলেই দুঃখ অশান্তি আছে। দুঃখ অশান্তিতেই প্রেমের পরীক্ষা হয়—তাই দুঃখ কবির কাছে অভ্যর্থিত। ব্যাকুল বেদনায় রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছেন, "যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকালবেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।" (তদেব, 'কী চাই', পৃঃ ৩৯)

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই সকল উন্নতির মূলে; রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় এই প্রত্যয়টির বিশেষ স্থান আছে। মনুষ্যত্বের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি ও আত্মার দ্বন্দ্ব বলে প্রতিভাত হয়েছে। "স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা; একথা তার বলবার যো নেই যে, এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।" (শান্তিনিকেতন ২, 'দ্বিধা', পৃঃ ১০২-৩)।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের বিজয় প্রত্যক্ষ করেছেন।

দুঃখ যে মানুষকে বৃহৎ করে এবং সেই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে তোলে, এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র ব্যক্ত করেছেন, এখানে তারই সমর্থন পাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস (৭ই পৌষ) ও মৃত্যুদিবস (৬ই মাঘ) উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-

বোধের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, "সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। শিখা থেকে শিখা জ্বালতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে। এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয়, ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। ... ...একদিন কোন ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃত-জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়ালো তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইলো না।" (শান্তিনিকেতন ১, 'মৃত্যুর প্রকাশ', পৃঃ ১৭৭-১৭৯)।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তাহলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুইদিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যা যুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তারপরে একেবারে নির্ভয়, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃত নিকেতন, সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু, তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি—সত্যদীক্ষার এই অর্থ।" (তদেব, 'দীক্ষা', পৃঃ ৭২-৭৩)।

নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে দিন-রাত্রির প্রাত্যহিক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সজনে নির্জনে যে তাঁরই লীলার আসন পাতা রয়েছে, বীরভূমের রুক্ষ গৈরিক প্রান্তরে যে তাঁরই ভক্ত জীবনের দীক্ষা ও পরম বাণী লাভ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ ও ৬ই মাঘের উৎসব উপলক্ষ্যে, সেই উপনিষদ ব্রহ্মের তথা সমস্ত অন্তরের ব্যাকুলতা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

॥ ৪ ॥

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার রচনাস্থল বীরভূমের উদাস সন্ন্যাসী গৈরিক প্রকৃতিভূমি। তাঁর অধ্যাত্মসাধনার যোগ্য পটভূমিরূপে এই অবারিত উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মন্দির-তোরণে প্রত্যাবর্তকালে ধ্যানে বসতেন। ধ্যানাশ্রিক ভাষণগুলিতে এই প্রকৃতির উপস্থিতি প্রকট। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনাকে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি সমর্থন জানিয়েছে ও সহায়তা করেছে, যেমন করেছে পল্লীপ্রকৃতি, নির্জন বালুচর ও জনপদগুলি সোনারতরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছের নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতার উদ্বোধনে। বীরভূমের কৃচ্ছ্রসাধনার ক্ষেত্রে এসে কবিতা ও গল্পের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার স্থলে পাই যে নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা ও গান—সেগুলিতে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার স্পর্শ রয়েছে। তাই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পড়তে পড়তে আমরা শান্তিনিকেতনের পটভূমি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। জগৎ ও জীবনের আনন্দকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করেই কবির সাধনা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগৎকে অভ্যর্থনা করেই তাঁর ঈশ্বর-সন্ধান তার প্রমাণ এখানে রয়েছে।

মহর্ষির দীক্ষাদিবসে এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সাধনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন, সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসে যে সাধক [দেবেন্দ্রনাথ] আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য জীবনে উপলব্ধি করেছেন, তা কি আমরা আশ্রমবাসীরা প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন, বলেছেন—প্রকৃতির মধ্যে সেই অমৃতময় রহস্য পদচিহ্ন রেখে গেছে, তাই প্রকৃতি-সৌন্দর্য উপভোগের অর্থ অমৃতময়ের স্পর্শলাভ। এই ভাষণে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি স্পষ্টরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কবি বলেছেন, "এই যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলিফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র

কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তরবায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধপ্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। সেই 'এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ', যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত ঊষার আলোয়, কত-দিনের অবসান-বেলায়, কত নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকে কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বার হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণ-হৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃত-বর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না।……তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ, সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।" (শান্তিনিকেতন ১, 'আশ্রম', পৃঃ ৪০২-৬০৩)।

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার সর্বত্র এই পটভূমি কবির অধ্যাত্ম-সাধনার যোগ্য সঙ্গীরূপে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা তাই বীরভূমের প্রকৃতির

সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। উৎসবরাজ অলক্ষ্যে থেকে উৎসব পরিচালনা করছেন—উপরের এই ভাবটি 'শারদোৎসব' ও 'রাজা' নাটকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেই উৎসবরাজের একান্ত ভক্ত ঠাকুরদা আর এখানকার ভাষণদাতা রবীন্দ্রনাথ কি একই ব্যক্তি নন?

॥ ৫ ॥

ছিন্নপত্র যেমন সোনারতরী-চিত্রা চৈতালী-গল্পগুচ্ছের পটভূমি ও উপাদানের ভাণ্ডার, 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালাও তেমনি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-শারদোৎসব-অচলায়তন-রাজা-ডাকঘর-প্রাচীনসাহিত্যের পটভূমি ও উপাদানস্থল; রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক রূপেও 'শান্তিনিকেতন'-এর বিশেষ মূল্য আছে। বস্তুতঃ দুঃখ, মৃত্যু, অহং, আত্মা, প্রেম, জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিকীর্ণ নানা অভিমতের সার এখানেই পাই। এজন্যই এই গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়নিচয় সম্পর্কে কবির বক্তব্য অধিগত করার অর্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভ। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ধৃত 'পূর্ণ' ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের পরিপূরক, আবার প্রথম খণ্ডে ধৃত 'তপোবন' ও 'বিকারশংকা' ভাষণ দুটি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের পরিপূরক। পুনশ্চ, দ্বিতীয় খণ্ডে ধৃত 'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ' ও 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' ভাষণ তিনটি 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' কবিতার পরিপূরক।

উপনিষদের উদার আকাশতলে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা রচনা করেছেন, একথা পূর্বেই বলেছি। তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি আরেকটি ভাবনা—রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাতাবরণ উপনিষদের মন্ত্রগুঞ্জরিত, হোমধূমে পবিত্র ও সামগানে মুখরিত। 'প্রাচীন সাহিত্য' সমকালে রচিত গ্রন্থ; তা কেবল প্রাচীন সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত কাব্যনিচয়ের সমালোচনা নয়, সেগুলিকে উপলক্ষ্য করে কবি ভারত আবিষ্কারে বেরিয়েছেন এবং শেষে সেই ঔপনিষদিক সাধনক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' নব সৃষ্টি; ভারতের ঐতিহ্য ও শিক্ষার পুনরাবিষ্কার। মহাকবি কালিদাসের দুই অমর কাব্য অবলম্বনে রচিত 'প্রাচীন সাহিত্য'-ধৃত দুটি প্রবন্ধ 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এই ভারতদর্শনের পরিচয়স্থল। ভারতের সাধনা চিরদিনই ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে, কাম অপেক্ষা প্রেমকে, বিলাস

অপেক্ষা তপস্যাকে বড় করে রেখেছে। এই শিক্ষাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধটিতে এটি কবি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; বলেছেন, "প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তি বশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ। এইজন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই।......তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা।" (শান্তিনিকেতন ১, পৃঃ ৪১৯-৪২০)।

পুনশ্চ, "অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখ দুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে।...... একথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকে, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া ভালো। এই 'যেমন-হওয়া-ভালো'র দিকে 'যেমন-হয়ে-থাকে' চলেছে, এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করেছে, পূর্ণ করেছে। 'যেমন-হয়ে-থাকে' হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর 'যেমন-হওয়া-ভালো' হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও 'যেমন-হয়ে-থাকে' তপস্যার দ্বারা অবশেষে 'যেমন-হওয়া-ভালো'র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য, শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।" (তদেব পৃঃ ৪২০-২৩)।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র উক্ত প্রবন্ধদুটির ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্বের সম্পূর্ণ সমর্থন এখানে পাই।

সাহিত্যে ও জীবনে, চিন্তায় ও বচনে, কর্মে ও ব্যবহারে প্রেমে ও বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তির সন্ধান করেছেন, তার আভাস 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থেই পাই। উপনিষদের আনন্দরূপের মাঝেই কবি মুক্তির সন্ধান করেছেন। রূপের অন্তরালে যে আনন্দ আছে, তাহাই মুক্তি। উপনিষদের এই

চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি না বুঝলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেমতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব আমরা আয়ত্ত করতে পারব না। এই চিন্তাটি কবি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাব আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে, এইকথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। এই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছিনে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেদিন দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি, লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।" (শান্তিনিকেতন ১, পৃঃ ৩৮৭)।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে উমা কি একথাই বলেন নি যে, এবার বসন্তসখা মদনের সহায়তায় নয়, তপঃসাধনায় মহেশ্বরকে জয় করব? 'রাজা' নাটকের গানে রাণীর মনের বেদনা কি একই কথায় প্রকাশ হয় নি—'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব'? মহুয়া কাব্যে এই মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের কথাই কি ঘোষিত হয় নি?—

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।

'শেষের কবিতা' উপন্যাসে প্রাত্যহিকতার অভিশাপমুক্ত মুহূর্তের দৈন্যমুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেমের কথাই কি ঘোষিত হয়নি ?—

তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে ; কিছু আর নাহি বাকি।
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি।
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্বহাসি।
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি ॥

॥ ৬ ॥

বর্তমান আলোচনার সূচনায় বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা ও সাহিত্য-সাধনা—পরস্পরসংযুক্ত এবং এক উৎসজাত, সে উৎস উপনিষদ। উপনিষদের বৈদিক ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর। উপনিষদ বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। উপনিষদ সম্পর্কে কবির মনোভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই কথায়—"উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।" (শান্তিনিকেতন ১, 'প্রার্থনা', পৃঃ ৪০)

উপনিষদের শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বরূপে নয়, জীবনের গভীর সত্যরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা কবিকে নীরস ব্রহ্মজ্ঞানী করে তোলে নি, তাঁকে সরস ব্রহ্মোপাসক করে তুলেছিল। এই 'প্রার্থনা' শীর্ষক ভাষণটি কাব্যমূল্যে অন্তরের সত্যমূল্যে জীবনের মহত্তম উপলব্ধির সুন্দর প্রকাশরূপে আমাদের কাছে বর্তমান। উপনিষদের সুকঠিন ধর্মজিজ্ঞাসা ও অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি বড় কোমল মধুর সুবাস বিকীর্ণ হয়েছে। তা হল মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি। এই মন্ত্রটি ফুলের মতো কোমল ও মধুর। তার গন্ধে কবি-চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। 'প্রার্থনা' ভাষণটি কবিচিত্তের ব্যাকুলতার প্রকাশ। এটি পড়লে অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে উপনিষদের শিক্ষাকে আপন অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র ভাষণটি গদ্যে লেখা একটি সম্পূর্ণ কবিতা।

কবি বলেছেন : "উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ একপ্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।...

সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই। তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি, তখন আমরা সমস্ত উপকরণটি অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাইনে, আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনও শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্য বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে বলে উঠলো—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবীরাবীর্ম এধি,
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো, সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন করো। তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।" ('প্রার্থনা', শান্তিনিকেতন ১; পৃঃ ৪৪)। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কবির কাব্যভাবনা ও আধ্যাত্মব্যাকুলতা এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল বর্তমানের কবি নন, তিনি নিত্যকালের ভারতবর্ষের বাণীবাহক, সে পরিচয় এখানেই পাই।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্তা

॥ ১ ॥

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের সূচনাটি বড় সুন্দর। রসিক সূত্রধার ও তৎপত্নী রসিকা নটীর সরস আলাপনে ও গানে দর্শকচিত্ত মোহিত হয়, আমরা সেইক্ষণেই হঠাৎ নাটকের ঘটনাপ্রবাহের মাঝে গিয়ে পড়ি। সূত্রধার গোড়াতেই নটীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'প্রিয়ে, আজ এই রাজসভায় কত সুপণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হয়েছেন। আজ বিশেষ সাবধান হয়ে অভিনয় প্রযোজনা করা প্রয়োজন, প্রতি অভিনেতার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।' নটী প্রত্যুত্তরে বলেছে—'তুমি অভিনয়কার্যে যেরূপ সুদক্ষ ও আজকের অভিনয়ের যেরূপ জোগাড়যন্ত্র করেছ, তাতে কোন স্থলে কোনো ত্রুটি হবে বলে আমার মনে হয় না।' এই প্রশংসার উত্তরে সূত্রধারের বিখ্যাত উক্তিটি পুনঃস্মর্তব্য—

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥

'যতক্ষণ না পণ্ডিতদের তৃপ্তি না হবে, আমাদের অভিনয় দর্শনে তাঁরা আনন্দিত না হবেন, ততক্ষণ, আমরা যত নিপুণই হই না কেন, আমার ধারণা, অভিনয় বিষয়ে আমাদের সে নৈপুণ্যের (প্রয়োগবিজ্ঞানের) কোনো মূল্য নেই। যিনি যতবড় শিক্ষিতই হোন না কেন, নিজের যোগ্যতা বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিহান কেহই নন, হতে পারেন না।'

তারপর নটীর সময়োপযোগী সুমধুর সংগীত। সে গানে সূত্রধার মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রযোজনা-কর্তব্য বিস্মৃত হতে বসেছিলেন—তার কৈফিয়ৎ-ছলে আসন্ন দৃশ্যের উপমা দিয়ে বলছেন—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

'ওই অতি বেগবান হরিণটা যেমন এই রাজা দুষ্মন্তকে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন জোর করে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তদ্রূপ, তোমার এই

হৃদয়গ্রাহী গীতমাধুর্যে আমার চিত্ত এতই বিমোহিত হয়েছে যে, পূর্বের কথা আর আমার কিছুই মনে নেই, সব ভুলে গেছি।'

এই কথার পর উভয়ের প্রস্থান। এখানেই প্রস্তাবনার সমাপ্তি ও মূল নাটকাভিনয়ের সূচনা। তারপরই নাট্যকারের নির্দেশনামা—'ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ'—তারপর মৃগের অনুসরণ করতে করতে রথারোহণে ধনুর্বাণ হাতে রাজার প্রবেশ, সঙ্গে সারথি। শুরু হয়ে গেল নাটক।

তারপর রাজা ও সারথির কথোপকথনে দর্শকরা জানতে পেলেন যে, বাণক্ষেপে উদ্যত রাজা রথে ছুটছেন। আর ঐই সামনে প্রাণভয়ে ভীত মৃগ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। মৃগ এত দ্রুত ছুটছে যে আর তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, বন্ধুর উচ্চাবচ ভূমিতে সারথি ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে, সমতল ভূমিতে পৌঁছেই সে রাশ আলগা করেছে। ঘোড়াগুলি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। ঘোড়াগুলি এত দ্রুত ছুটছে যে পাশে বা দূরে বলে কিছুই মনে হচ্ছে না, এক নিমেষ আগে যেটা দূরে ছিল, এখনি তাকে কাছে, এবং যা কাছে ছিল, তাকে দূরে দেখছি। অতি দ্রুত ধাবমান রথ ধাবমান মৃগের সন্নিধানে উপনীত হয়েছে, রাজা তূণস্থ শরযোজনা করেছেন। বাণ ছাড়তে যাচ্ছেন, সেই মুহূর্তে নেপথ্যে মুনিকণ্ঠে শোনা গেল—ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ—মেরো না, মেরো না আশ্রমমৃগকে বধ কোরো না।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই অভিনীত হল। মঞ্চে রথ, মৃগ, অশ্ব কিছুই উপস্থিত হয় নি, তার মায়া সারথি ও রাজার কথায় রচিত হয়েছে। রাজার শরসন্ধানের নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন এক কথায়—(শরসন্ধানং নাটয়তি)—শরসন্ধানের অভিনয় করলেন।

এখানে দৃশ্যমায়া (Illusion) বাস্তব থেকে সত্যতর বলে দর্শকচিত্তে প্রতিভাত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্তায় এই কৌশল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রসঙ্গেই উপরোক্ত দৃশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ-ছোটানো বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড়ো কবি, রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত তাহা নহে; কিন্তু আমি

বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য, যাহা বড়ো তাহা কেন নিজেকে কোন অংশে খর্ব করিতে যাইবে। ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবি-কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

"অতএব যখন দুষ্মন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি-সামান্ত কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়; অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ত্রুটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগা কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত।

"শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কথাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারও উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কী চরিত্র সৃজনে, কী স্বভাবচিত্রে, নিজের কাব্য সম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।" ['রঙ্গমঞ্চ', বিচিত্র প্রবন্ধ]

নাটক অভিনয়ের পরাধীন নয়, স্বাধীন, বরং অভিনয়ই নাটকের অধীন, এ'কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। তাঁর দীর্ঘকালের নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, তিনি অভিনয়ের প্রয়োগবিজ্ঞানের খাতিরে দৃশ্যকাব্যকে বিসর্জন দেন নি।

মঞ্চ-মায়ার (Stage-illusion) প্রতি অধুনা আমাদের দেশে যে ঝোঁক ও একান্তনির্ভরতা বিভিন্ন পেশাদারী ও অপেশাদারী অভিনয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরেই তার প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পাবলিক রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয় করেছেন, তখন তিনি প্রচলিত মঞ্চ-কৌশলের উপর নির্ভর করেন নি। বাংলা নাটকে যেমন বহুকাল ধরে শেক্সপীয়রীয় পঞ্চাঙ্ক নাটকের অন্ধ অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়, তেমনি মঞ্চে বিলেতি আড়ম্বরপূর্ণ সেট-এর উপর অন্ধ নির্ভরতা ছিল। এজন্যই ঐতিহাসিক

ও ধর্মভিত্তিক নাটকের রচনা ও অভিনয়ে গিরিশ-যুগের নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতৃবৃন্দ উৎসাহ বোধ করতেন। প্রতীক-নাটকের অভিনয় তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তা রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তার প্রযোজনাও করলেন।

উক্ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।.........অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপন গৌরব দেখাইতে পারে।"

নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন, কেননা এই সংলাপকে অবলম্বন করেই হাবভাবের দ্বারা অভিনেতা চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু দৃশ্যপট ?

"তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়।......তা ছাড়া, যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানাকড়িও নাই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন-সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।"

কিন্তু, হায়! বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শকের শারীরিক অর্থে বয়স হয়েছে, মনের বয়স হয় নি। অতি সম্প্রতি তারা মনের দিক দিয়ে সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে, কিন্তু তাতেও খট্‌কা লাগে।

আসলে বাঙালি দর্শক শিশু। আড়ম্বরপূর্ণ সেট-দৃশ্য সে খুব পছন্দ করে। রঙ্গমঞ্চে সপ্ততল ভেদ করে গঙ্গাবারির আকস্মিক উত্থান, গোবিন্দলালের পটাপট্ শার্ট ছিঁড়ে ফেলে বারুণী পুষ্করিণীতে ঝম্পপ্রদান, অশ্বারোহী প্রতাপ ও গোবিন্দলালের মঞ্চে আগমন তিরিশ বছর আগে ছিল, এখন মঞ্চে ট্রেনের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি, পাতালে কয়লাখনিতে জলমগ্ন হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ভয়ঙ্কর দৃশ্য, ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টিধারার পতন বা দৃশ্যপটের ক্ষীণ শশাঙ্কলেখার

ক্রমশঃ পূর্ণচন্দ্রে পরিণতি, স্বপ্নে পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের চাক্ষুষ দৃশ্য বা ফ্লাশ-ব্যাকে বিগত জীবনের নায়িকার সশরীরে উপস্থিতি হামেশাই ঘটছে।

এরই বিরুদ্ধে নাট্যপ্রযোজক রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এইজন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের যাত্রার অভিনয়কৌশলের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। তিনি বলেছেন, "যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্প-বিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে। একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কি করিতে বসিয়া আছে।"

তাই যাত্রার অভিনয়ে দর্শকের মন ছাড়া পায়, তার চিত্তক্ষেত্র প্রসারিত হয়, জনাকীর্ণ আসরে বসেই দর্শক এক মুহূর্তে রাজান্তঃপুর, পর মুহূর্তেই রণক্ষেত্র, তারপরই শশ্মানে দৃশ্য-পরিবর্তনকে মনে মনে গড়ে তোলে, তার কল্পনা সেখানে যা অনুপস্থিত তাকে উপস্থিত বলে গ্রহণ করার সবলতা ও বিশালতা অর্জন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটি স্ফীত পদার্থ।..........দর্শক যদি বিলাতি ছেলে-মানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়।" [রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ ; নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত।]

রবীন্দ্রনাথ তাই মঞ্চের চিত্রপটের উপর নির্ভর করতে চান নি, তিনি দর্শকের চিত্তপটের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

এই বিষয়ে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন নাট্যজগতে প্রবেশ করেন, তখন দৃশ্যপটকে

অবহেলা করেন নি। হয়তো ও-সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত তখনও দৃঢ়ীভূত হয়ে ওঠে নি, কিংবা ওদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া তিনি দরকার মনে করেন নি। তারপর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকেও দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৩০৯ সালে পূর্বোক্ত মত প্রকাশের পরেও অনেককাল পর্যন্ত তিনি দৃশ্যপট বর্জন করেন নি। ১৩২২ সালে 'ফাল্গুনী' নাট্যাভিনয়ে এবং তারপরে 'ডাকঘরে'র সময়েও যে তাঁর অনুষ্ঠানে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল—এটা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি—যদিও সেই সব দৃশ্য-সংস্থানের সঙ্গে থিয়েটারের তথাকথিত 'সিন-সিনারি'র পার্থক্য ছিল আসমান-জমিন। সুদীর্ঘকাল পরে ১৩৩৬ সালে 'তপতী' নাট্যাভিনয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রকাশ্যভাবে তাঁর পুরাতন মত প্রকাশ করেন—'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সেই অভিনয়ে সুচারু মঞ্চসজ্জা ছিল, কিন্তু পট পরিবর্তন হয় নি।" ('সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', পৃ ১৪৪-৪৫)।

এখানে এ'কথা অবশ্যস্মর্তব্য যে বিখ্যাত 'সঙ্গীত-সমাজে'র নাট্যসম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার হয়ে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন দশ বৎসর কাল (১২৯৮-১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকের বহিঃপ্রেরণা 'সঙ্গীত সমাজে'র তাগাদা, তার ফল 'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯) ['শেষরক্ষা'], 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩)। আর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর তাগাদায় রচিত হয় 'চিরকুমার সভা' (১৩০৭)। 'সঙ্গীত সমাজ' ছিল রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান, দুটি বিষয়ে তা প্রমাণিত হয়। স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষের অভিনয় ও বর্ণাঢ্য দৃশ্যপটের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভাবে নাট্য প্রযোজনা করে এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে সোজাসুজি বর্জন করেছেন; 'সঙ্গীত সমাজে' সে স্বাধীনতা ছিল না। ঠাকুরবাড়ীতে ও শান্তিনিকেতনে নাট্য প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ সে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। 'সঙ্গীত সমাজে' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', 'অলীকবাবু', 'পুনর্বসন্ত' ও 'ধ্যানভঙ্গ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়েছিল। এ-সব অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়-শিক্ষকের কাজ করেছিলেন।

॥ ২ ॥

নাটক রচনা, অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ কৃতিত্বের যথার্থ মূল্য-নিরূপণ আজ পর্যন্ত বিশেষ করা হয় নি। ১৮৭৭ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ—সুদীর্ঘ বাষট্টি বৎসর কাল ধ'রে রবীন্দ্রনাথ নাট্য-প্রযোজনা ও অভিনয়ের দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই ইতিহাস সযত্নে অনুধাবন না করলে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যাবে না। তাই সে প্রয়াসে নিযুক্ত হওয়া যাক্।

একটা বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মুখ চেয়ে নাটক (play) লেখেন নি, তিনি play-wright ছিলেন না; সাহিত্যবোধানুপ্রাণিত হয়ে রঙ্গমঞ্চ-নির্ভর না হয়ে তিনি সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ নাটক (drama) রচনা করেন, তিনি ছিলেন dramatist। বাংলায় আমরা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করি না বলেই সবাইকে নাট্যকার বলি। গিরিশচন্দ্র ছিলেন মুখ্যতঃ Playwright। রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ('আলমগীর'), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('কর্ণার্জুন'), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ('সীতা') এই দলের। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সাহিত্যনাটক-রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মঞ্চনাটক ও সাহিত্য-নাটক, দুই-ই লিখেছেন। তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' 'সাজাহান' মঞ্চনাটক (play), আর 'পাষাণী', 'সীতা' সাহিত্যনাটক (drama)।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সাহিত্যনাট্যকার (dramatist)। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ও মঞ্চনাটক সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা ছিল, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বাংলায় 'রীডিং ড্রামা' (reading-drama) খুবই কম, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের আশ্রয়স্থল।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বধৃত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে আমরা সকলে মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই। ...... স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া

উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে—আমার যদি অভিনয় হয় ত হউক, না হয় ত অভিনয়ের পোড়া কপাল—আমার কোন ক্ষতি নাই।" [বিচিত্র প্রবন্ধ]। আর গিরিশচন্দ্র বৃত্তির খাতিরে, জীবিকার তাগিদে নাটক রচনা করেছেন, বলেছেন—"সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—ব্যবসায়ের খাতিরে—রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী দেখে নাটক রচনা করতে হয়। ···নাট্যকারের শুধু কল্পনায় বিভোর হয়ে নাটক লিখলে হবে না—রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রুচি দেখে নাটক রচনা করতে হয়। ······সত্যি বলছি আমার dramatist হবার কোনও কালে ambition ছিল না।···স্টেজে আর কোনোও অভিনয়োপযোগী নাটক মিলল না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হল।" এই অচরিতার্থতার বেদনা গিরিশচন্দ্র সারা জীবন বহন করেছেন। শেষ জীবনে মঞ্চনাটক ছেড়ে অন্তঃসংগ্রামের ভিত্তিতে সাহিত্যনাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন, মৃত্যুর দ্বারা তাঁর সে প্রয়াস খণ্ডিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র সাহিত্যনাটক (drama) রচনায় সাফল্য লাভ করেছেন। যেমন 'বিল্বমঙ্গল' ; ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এর স্থান হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের এ আক্ষেপ ছিল না, পাদপ্রদীপের আলোয় নাটকের সফলতা তিনি বিচার করতে চান নি, নাট্যসরস্বতীর প্রসাদ লাভে ধন্য হতে চেয়েছিলেন, নটলক্ষ্মীর কৃপা ভিক্ষা করেন নি।

তথাপি রবীন্দ্রনাথ নাট্য-প্রযোজক। সেই দীর্ঘ বিচিত্র কাহিনীর কাঠামোটা চোখের সামনে না থাকলে এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব পরিমাপ করা সম্ভবপর হবে না।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-জীবনের সঙ্গে প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব জড়িয়ে আছে। মঞ্চচিন্তা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে বহু পরে, কিন্তু তার সূচনা হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন 'অলীকবাবু'র নাম-ভূমিকায়। তারপর 'সঙ্গীত সমাজে' এটি অভিনীত হয়, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর ১৮৭৮-এ বিলাত যাত্রা করেন। এ যাত্রায় বিলাতে ছিলেন দেড় বৎসর। তখন বিখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক স্যার হেনরী আর্ভিং বিখ্যাত লিসিয়াম থিয়েটারের পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় (১৮৭৮-৮০) বিলাতের

পাবলিক রঙ্গমঞ্চে এলিজাবেথীয় পঞ্চাঙ্ক নাটক ও গীতিনাট্য অভিনীত হচ্ছে সমারোহে। এই অভিনয়-দর্শন প্রযোজক ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৮৮০-তে দেশে ফিরে এসেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মদনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভূমিকালিপিতে ছিলেন: শচী—নীপময়ী (হেমেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী), ইন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ)। এই গীতিনাট্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি গান—"আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি।" পাশ্চাত্ত্য গীতিনাট্যের সুর ও অভিনয়কৌশল রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

১৮৮১-তে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হল। এই অভিনয়ে কেবল আত্মীয়স্বজন নয়, ক'লকাতার গুণীজন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, গুরুদাস) দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পাশ্চাত্ত্য মেলডি এতে প্রয়োগ করা হয়। এই অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বারবার 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। এর সুন্দর বর্ণনা আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে এর পুনরভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তোলার প্রয়োজন ছিল এর মূলে। পাবলিক স্টেজে নট ও নাট্যকার রূপে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আবির্ভাব।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর বাড়ীতে অভিনীত হল 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (দশরথ), রবীন্দ্রনাথ (অন্ধমুনি) ও ঠাকুর-পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এতে অভিনয় করলেন। দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ।

এরপর ১৮৮৮-তে 'সখী সমিতি' বেথুন স্কুলে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' (সংগীতপ্রধান নাটক) অভিনীত হল। পরে এম্পায়ার থিয়েটারে সরলা দেবীর উদ্যোগে এটি পুনরভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর রচয়িতা, গীতিকার ও সুরকার; প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন মহিলারা।

'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', এই তিনটি গীতিনাট্যের রচয়িতা ও প্রযোজক, গীতকার ও সুরকার রূপে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হ'ল 'রাজা ও রাণী'। এর প্রথম অভিনয় হয় ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে)। ভূমিকালিপি : বিক্রমদেব—রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নারায়ণী—মৃণালিনী, কুমার সেন—প্রমথ চৌধুরী, তা ছাড়া ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। এই বৎসরের শেষভাগে এমারেল্‌ড থিয়েটারে পেশাদারী অভিনেতৃবর্গ 'রাজা ও রাণী' মঞ্চস্থ করেন। ভূমিকালিপি : বিক্রমদেব—মতিলাল সুর, সুমিত্রা—'গুলফম' হরিমতী, ইলা—কুসুম কুমারী, দেবদত্ত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য।

'রাজা ও রাণী' পাবলিক ষ্টেজে অভিনীত ও আদৃত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকার খুশী হন নি—'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত'—এ'কথা তাঁর মনে হয়েছে এবং বহু বৎসর পরে এটিকে সংশোধন করে লিখেছেন 'তপতী'। অথচ কুমার সেন চরিত্রে ('তপতী'তে এটি বর্জিত হয়) অভিনয় করে সেদিন পাবলিক ষ্টেজের অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু দর্শক সমাজের কাছে 'ট্রাজেডিয়ান' আখ্যা লাভ করেন। অপ্রাসঙ্গিকতা, নাটকের উদ্দেশ্যচ্যুতি, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও মেলোড্রামাটিক চমৎকার উপাদান 'তপতী'তে নেই। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ত্রুটিপূর্ণ 'রাজা ও রাণী'কে গ্রহণ করল, 'তপতী'কে নিল না। জনতা-দৃশ্যের তামাশা, নায়ক-নায়িকার ভাবাবেগোন্মত্ত দীর্ঘ সংলাপ, মঞ্চে ছিন্ন মুণ্ড প্রদর্শন, গীতিবাহুল্য, অপ্রধান বিষয়ের অতিপ্রাধান্য : এই সব ত্রুটিই 'রাজা ও রাণী'র জনপ্রিয়তার মূল। বোধ করি, 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'আলমগীর', 'বঙ্গেবর্গী', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয়তার রহস্য এখানেই নিহিত।

'রাজা ও রাণী' প্রযোজনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। এলিজাবেথীয় মঞ্চকৌশল এখানে গৃহীত হয়েছিল।

এর পর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বিসর্জন' প্রথম অভিনীত হল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্ক স্ট্রীটের প্রাসাদোপম বাড়ীতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, তারপর 'সঙ্গীত সমাজে' এটি অভিনীত হয়। সেখানে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও জয়সিংহের ভূমিকায় হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। বহু কাল পরে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ হয়; সেদিনের ভূমিকালিপি ছিল : জয়সিংহ—রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ-

মাণিক্য—গগনেন্দ্রনাথ, রঘুপতি—দিনেন্দ্রনাথ, নক্ষত্রমাণিক্য—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রযোজনা ও দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা এই অভিনয়ে লক্ষ্য করা যায়। এম্পায়ার থিয়েটারে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শককুল। এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণায় শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "চলনে, কথনে, দেহে ও ভাব-ভঙ্গিতে জয়সিংহ ভূমিকার অভিনেতা যে যুবক নন, এ সত্য ধরা পড়ল না একবারও। নিজের পক্ক ও দীর্ঘ শ্মশ্রু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে গোপন রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর অঙ্গবিন্যাস, স্বরবিন্যাস ও আবৃত্তিকৌশল অমর হয়ে থাকবে—তিনি ছিলেন একেবারেই অননুকরণীয়। গগনেন্দ্রনাথকে দেখে মনে হয়েছিল সেকালের একজন সত্যিকার রাজাকেই দেখলুম। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের মর্মভেদী দৃষ্টি ও বিপুল দেহই কেবল মানানসই হয় নি, তাঁর অভিনয়ও বেশ উৎরে গিয়েছিল।"

('সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ৭১)

'বিসর্জনে' শেষের দিকে এক দৃশ্যে আছে, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ রঘুপতি কালী-প্রতিমাকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করছেন। এ দৃশ্য বাদ দেওয়া চলে না, অথচ 'ধর্মপ্রাণ' বাঙালি দর্শক নাকি এ দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হবে, এই আশংকায় পাবলিক ষ্টেজে এ নাটকের অভিনয় হলই না!

রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহ, রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র অভিনয় করে-ছিলেন। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ভাবপ্রকাশে তাঁর সব্যসাচিত্বের পরিচয় এখানে পাই। পেশাদারী নটের কোনো বিশেষ টাইপ চরিত্রের রূপদানে তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ এইখানে ইতি করেন। অভিনয় পরিচালনা ও প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জনে' দেখা গিয়েছে। স্টার ও এমারেল্ড্ থিয়েটারে সাধারণ দর্শক সমাজের সামনে এ দুটি তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। তথাপি আমাদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এর থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নি।

'সঙ্গীত-সমাজে'র অভিনয় শিক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'গোড়ায় গলদ' (পরে 'শেষ রক্ষা'), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'—তিনটি সামাজিক

প্রহসন রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রহসন ও কৌতুক নাট্যের নামে যে অশ্লীল বা নিম্নরুচির পঙ্করং তামাশা অভিনীত হ'ত, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রহসন-রচনা ও অভিনয় সুস্থ ব্যতিক্রম। কিন্তু এও গৃহীত হয় নি।

কেবল শিশিরকুমার ভাদুড়ী এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসাধক রূপে দেখা দিয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ'কে পরিবর্ধিত করে 'শেষ রক্ষা' রচনা করেন; এটির অভিনয় হয় 'নাট্য-মন্দিরে'। ভূমিকা-লিপিতে ছিলেন চন্দ্রবাবু-রূপী শিশিরকুমার, তা' ছাড়া রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল দত্ত, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, চারুশীলা, প্রভা, কৃষ্ণভামিনী। এই অভিনয়ে শিশিরকুমার নোতুনত্ব দেখিয়েছিলেন—শেষ দৃশ্যে তিনি (চন্দ্রবাবুর ভূমিকায়) রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারে নেমে এসে দর্শকদের মাঝে বসতেন। এর আগে বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা আর কখনো হয় নি। 'গোড়ায় গলদে'র প্রথম অভিনয় হয় 'সঙ্গীত সমাজে'র উদ্যোগে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিনয়-শিক্ষাদাতা ও পরিচালক। তিনি কেবল সর্বশেষে হাসির গান গাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন।

'সঙ্গীত সমাজে'ই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হয়। কেদারের ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর অবিনাশ হয়েছিলেন নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। তেইশ বৎসর পরে জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা' ক্লাবে এর অভিনয় হয়। মঞ্চসজ্জায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা সেখানে দেখা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও ভক্তেরা তাতে অভিনয় করেন। অথচ পাবলিক স্টেজে এটির অভিনয় হল না, কারণ এতে নারী ভূমিকা নেই! আর 'চির-কুমার সভা' অভিনীত হল স্টার থিয়েটারে আর্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা। স্টারের অভিনয়ে দৃশ্যপট ও মঞ্চসজ্জার ভার গ্রহণ করেন অবনীন্দ্রনাথ ও সংগীতের দায়িত্ব নেন দিনেন্দ্রনাথ। ভূমিকালিপি: চন্দ্রবাবু—অহীন্দ্র চৌধুরী, রসিক—অপরেশচন্দ্র, অক্ষয়—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নীরবালা—নীহারবালা। কিন্তু এও বেশি দিন চলল না। পরে শিশিরকুমার চন্দ্রবাবু ও রসিক—দুই ভূমিকাভিনয়ে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কৌতুক নাট্য—'বশীকরণ' অভিনীত হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে, প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু গিরিশোত্তর পেশাদার

রঙ্গমঞ্চ কোনো দিনই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক বা প্রহসন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করে নি।

প্রথম বিশ্বসমরের সময়ে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন রূপক ও প্রতীক-নাটকের জগতে। তার প্রযোজনা ও অভিনয় তিনিই করেছিলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করে নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকাভিনয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আগে সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকাভিনয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত আরেকবার স্মরণ করা যাক্। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' এই দুই পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকো ও পার্ক স্ট্রীটের ঠাকুর-বাড়ীতে। পাবলিক স্টেজেও এ দুই নাটকের অভিনয় ঠাকুর-বাড়ীর লোকেরা করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রহসনের ('গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা') অভিনয় হয়েছিল 'সঙ্গীত সমাজে'। টিকিট বেচে অভিনয় কয়েকবার হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ অভিনয়ের ব্যয় বহন করেন ঠাকুর-বাড়ী। দর্শক ছিলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিককুল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গ দু একবার এ অভিনয় দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এর থেকে কোন প্রেরণা পান নি।

দৃশ্যপটের ছেলেমানুষি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা ছিল; সে বিষয়ে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধধৃত অভিমত বিস্তারিত উদ্ধার করেছি। অস্বাভাবিক মেলোড্রামাটিক অভিনয় সম্পর্কেও তাঁর বিরূপতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: "রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের 'হ্যামলেট' ও 'ব্রাইড অফ লামার্মুর' দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি লইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই ঘোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।" ('পথের সঞ্চয়')

অসংযত আতিশয্য, অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে বহুকাল প্রভুত্ব করেছে, আজো তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ এরই বিরুদ্ধে। পরবর্তী প্রতীক নাটকাভিনয়ে এই বিদ্রোহ ও নোতুন সৃষ্টি পূর্ণতর রূপে দেখা দিল।

॥ ৩ ॥

এরপর রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাটক ও নৃত্যনাট্যের যুগ।

প্রতীক-নাটক 'রাজা' অভিনয়ের জন্য বাংলা দেশের জনসাধারণ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। এখনো পর্যন্ত দর্শক রঙ্গমঞ্চে চাক্ষুষ স্থূল ঘটনার অভিনয় দেখতে পেলে খুসী হয়। এলিজাবেথীয় নাট্যাভিনয়ের চমৎকার উপাদান ও ভাবাবেগোন্মত্ত দীর্ঘ সংলাপযুক্ত আবেগোচ্ছ্বসিত অভিনয়ের মোহ আজো সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নি।

দর্শকরা যে তৈরী ছিল না তার পরিচয়স্থল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে 'পরিত্রাণ'-এর অভিনয়। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'-এর অভিনয় বাঙালি দর্শক সাদরে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ'কে গ্রহণ করে নি, যেমন করেনি 'রাজা ও রাণী'র সংস্কৃতরূপ 'তপতী'র নাট্যাভিনয়। শক্তিমান গায়ক-নট তিনকড়ি চক্রবর্তী 'পরিত্রাণে'র ঐ অভিনয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী ভূমিকায় অভিনয় করেন, কিন্তু তা সাদরে গৃহীত হয় নি।

নাট্যসাহিত্যে ও নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে 'রাজা' পূর্বতুলনারহিত। এর সূক্ষ্ম মর্মাবেদন গৃহীত হল না। আমাদের পেশাদার রঙ্গালয়ের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ধ্যানধারণা ও সংস্কারের মধ্যে 'রাজা' বা তার সংস্কৃত রূপ 'অরূপরতনে'র কোনো ঠাঁই ছিল না।

প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নোতুনরূপে দেখা গেল 'অরূপরতনে'র অভিনয়ে শান্তিনিকেতনে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথ ভাবাভিনয় প্রবর্তন করলেন—নট-নটীরা করলেন মূক ভাবাভিনয় আর তাদের মুখে ভাষা দেবার জন্য নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করলেন মঞ্চাসীন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পরে তিনি নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তি প্রচলন করলেন শান্তিনিকেতনে; 'শাপমোচন', 'নটীর পূজা' নৃত্যাভিনয় তার পরিচয়। 'রাজা' বা তার সংস্কৃত-রূপ 'অরূপরতন', 'শাপমোচন' ও 'অচলায়তন' বা তার সংস্কৃতরূপ 'গুরু' অভিনীত হল শান্তিনিকেতনে। মূকাভিনয়, নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হল

আবৃত্তি ও যন্ত্রসংগীত। কলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের দর্শকরা এতে না পেল রস, না পেল এর নোতুন আস্বাদ।

এরপর 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'। প্রত্যক্ষ রূপলোক থেকে অপ্রত্যক্ষ ভাবলোকে মহৎ শিল্পীর যাত্রার অপূর্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ হল প্রতীক নাটকগুলিতে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হল 'ফাল্গুনী', রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন অন্ধ বাউলের ভূমিকা। প্রথম বিশ্বসমর কালেই রণবিধ্বস্ত ইওরোপে 'ডাকঘর' (Post Office) অভিনীত ও আদৃত হল। তখনও বাংলাদেশে 'ডাকঘর' অভিনীত হয় নি। তবে কি এদেশে তা সম্ভবপর নয়? এর উত্তর মিলল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রা'ক্লাবে 'ডাকঘর' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। ভূমিকালিপি ছিল: ঠাকুরদা—রবীন্দ্রনাথ, মাধব—গগনেন্দ্রনাথ, মোড়ল—অবনীন্দ্রনাথ, দইওয়ালা—অসিতকুমার হালদার, অমল—আশামুকুল দাশ ও সুধা—স্বরূপা (অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা)।

'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এই চার নাটকের দৃশ্যপট ও মঞ্চসজ্জা আমাদের দেশে অভূতপূর্ব। কিন্তু পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এর কোনো প্রভাবই পড়ে নি।

প্রথম বিশ্বসমরের কিছু আগে পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র জীবিত ছিলেন। ১৯০২ থেকে ১৯১১-র মধ্যে এঁরা লোকান্তরিত হন। কেবল রইলেন গিরিশ-পুত্র দানীবাবু। রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনায় বিপ্লব ঘটাচ্ছেন, মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটে যুগান্তর আনছেন, মঞ্চ-সংগীতে ও আবহ-সংগীতে নোতুন ধারা প্রবর্তন করছেন, তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কীর্তিমান নট-নাট্যকার-পরিচালকরা কিছুমাত্র প্রভাবিত হলেন না। বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পক্ষে এটি দুর্ভাগ্যের কথা। ফলে একদিকে যখন 'ফাল্গুনী' ও 'ডাক-ঘর' নোতুন যুগের সূচনা করছে, অপর দিকে 'কণ্ঠহার', 'বঙ্গে বর্গী', 'মোগল পাঠান', 'কিন্নরী' ও 'দেবলাদেবী' সমারোহে অভিনীত হচ্ছে ও পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মালিকরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করছেন।

কেবল শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতাতেও 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্যের জন্য কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনীত হল। মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটে, আবহসংগীত ও আলোক-প্রক্ষেপণে অভিনবত্ব

দেখা গেল। রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ, ঠাকুরদার ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ ও সর্বোপরি অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক নোতুন যুগের সূচনা করল। নাট্য-প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় এই অভিনয়ে পাওয়া গেল। প্রেক্ষাগারের দর্শকেরা শুনলেন নোতুন বাণী—'ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন। ···বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা! বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি!'—এই বাণীতেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নোতুনের পদধ্বনি শোনা গেল।

সেদিনের 'ফাল্গুনী' নাট্যাভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় এই অপূর্ব অভিনয়ের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন: "তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।··· ··প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু বার্ধক্যও যে শ্রীমন্ত হতে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। বাউল অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান দৃষ্টিতে তার মৌখিক ভাব দীপ্যমান। হাতে একতারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গীতে গান ধরলে—'ধীরে বন্ধু ধীরে'। সে কি হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, রাগিণীর ঝঙ্কারে তার কি গভীর ভাবের অভিব্যক্তি! যে কোনো মূর্ছিত চিত্তও তার ধ্বনির ইন্দ্রজালে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে! সেই অপূর্ব সুর-সুরধুনীর সঙ্গে বাউলের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের শ্রবণমনের উপরে ঝরে পড়তে লাগল। কত সেরা সেরা গুণীর গান শুনেছি কিন্তু মানসচোখে আর কারুর কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তেমনভাবে অরূপকে রূপধারণ করতে দেখি নি। এ আমার অতিবাদ নয়, সেদিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতের তেমন রূপায়ণ ধারণাতীত। এডোয়ার্ড টমসন সেই গীতাভিনয় দেখে বলেছিলেন: "Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid action with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes." ('সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ১২২)

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিনয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দুটি নাটকে—'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায় ও 'অরূপরতনে' অদৃশ্যরাজার নেপথ্য-

ভূমিকায়। সেদিন পঁচাত্তর বৎসর বয়সে রাজার বাঘর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সুরেলা কণ্ঠের ইন্দ্রজাল রচনা করে অদৃশ্য রাজা-চরিত্রটিকে দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন। সমসাময়িক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সুরপ্রধান বাচনিক অভিনয়ের সঙ্গে এই বাঘর অভিনয়ের আসমান-জমিন ফারাক ছিল। কৃত্রিমতা ও সংযমহীনতা পেশাদারী অভিনয়কে করেছিল ব্যর্থ, আর স্বাভাবিকতা ও শিল্পসংযম রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কে করেছিল সার্থক।

পেশাদারী থিয়েটারের বাচনিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উত্তর-সাধক ছিলেন প্রতিভাবান শিশিরকুমার। বাচনিক অভিনয়ে স্বাভাবিকতা, সুরে স্বাধীনতা ও শিল্পসংযম তিনি রক্ষা করেছিলেন।

আর ঋতুনাট্যাভিনয়ের সূচনা হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়ে। এই গীতাভিনয় শেষ পর্যন্ত ঋতুনাট্যে পরিণত হয়—'বসন্তোৎসব', 'শেষবর্ষণ', 'নবীন', 'সুন্দর', 'শ্রাবণগাথা' তার পরিচয়স্থল। নৃত্যগীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেও মঞ্চের একপ্রান্তে বসে রবীন্দ্রনাথ সূত্রধারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি সহযোগে নৃত্যগীতকে প্রাণময় করে তুলতেন। এই বিষয়েও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দ্বিতীয়-রহিত এবং অসামান্য। সমস্ত নৃত্যগীতাভিনয় সেই প্রতিভাধরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কণ্ঠস্বরের ইন্দ্রজালে প্রভাবিত হ'ত।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়। একটি মাত্র প্রধান চরিত্র নটীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবী। 'নটীর পূজা'য় যার সূচনা 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তার সফল পরিণতি। তাই নৃত্যনাট্য তথা ঋতুনাট্যের প্রযোজক রূপেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বারবার স্মরণযোগ্য। একটি প্রশ্ন থেকে যায়—রবীন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শ কি আমাদের রঙ্গমঞ্চে একেবারেই গৃহীত হয় নি? হয়েছে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের শোচনীয় ব্যর্থতার পাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের কৃতিত্ব। বহুরূপী-অভিনীত 'রক্ত-করবী' তার উজ্জ্বল পরিচয়।

দৃশ্যপটের প্রভুত্ব থেকে, অস্বাভাবিক মেলোড্রামাটিক অভিনয়ের দুষ্ট প্রভাব থেকে এবং স্থূল ঘটনা উপস্থাপনের ছেলেমানুষি থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছেন। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ অভিনয়শিল্প সাধনায় বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাটকে সমাজচিন্তা

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ বচনে-চিন্তনে লেখনে-মননে আচারে-ব্যবহারে সর্বাঙ্গীন আধুনিক ছিলেন। কোন আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রনির্দেশকে বিনা বিচারে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেকারণে স্বদেশী যুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মনের মুক্তিকে তিনি জীবনে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন, এই মুক্তি যেখানে ব্যাহত হয়েছে সেখানেই তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

কবি একদা বলেছিলেন, "যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন, এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হ'ল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।" ['আত্মপরিচয়']

রবীন্দ্রনাথ নোতুন ভারতবর্ষে তথা নোতুন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একথা অবশ্যস্বীকার্য। তিনি সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনায় একথা বারবার উপলব্ধি করেছিলেন যে 'পুরানো সঞ্চয় কিনে বেচাকেনা আর চলিবে না।' নোতুন যুগের স্বর্ণদ্বার খোলার কাজে পৃথিবীর সর্বত্র যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, কবি সোৎসাহে সর্বদা তাঁদের সমর্থন করেছিলেন। উনিশ শতকের মূল্যবোধগুলি দ্রুত ভেঙে পড়েছে, তার স্থানে আসছে জীবনের নোতুন মূল্যবোধ, এ তিনি চোখের সামনেই দেখেছিলেন এবং তাকে এড়িয়ে যান নি। একারণে তাঁকে ঘরে বাহিরে কম দুঃখ পেতে হয় নি, তার বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে ['কালান্তর']।

আমাদের আত্মপ্রতারণা ও নীচতা, পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা, অবিশ্বাস ও হীন সংশয় দেখে রবীন্দ্রনাথ বেদনা অনুভব করেছেন এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের শোচনীয় অভাব প্রত্যক্ষ ক'রে মনে-মনে পীড়িত হয়েছেন। সমাজচিন্তায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। খুব স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানবতার

অপমান যে-দেশে নিয়তই ঘটছে, সে-দেশ আপন নিগড়ে আবদ্ধ, তার মুক্তি হতে পারে না। মুক্তিসাধনার পথ কোথায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বক্তব্য :

"আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা। অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।" (তদেব)

সমাজচিন্তাপ্রধান রবীন্দ্র-নাটকের এই যোগ্য পটভূমি থেকে বর্তমান আলোচনার সূচনা।

॥ ২ ॥

হিন্দুসমাজের বিচারহীন মূঢ়তাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আঘাত করেছেন 'বিসর্জন' নাটকে (১৮৯০)। বাংলাদেশের সমাজে ও মধ্যযুগীয় কাব্যে মেয়ে-দেবতার অত্যাচারকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, "এক কালে পুরুষ-দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল

না। শামকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, 'আমার পুজো চাই।' অর্থাৎ 'যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই।' তোমার দলিল কী? গায়ের জোরে। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তারপরে যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।' এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।" [বাতায়নিকের পত্র, ৪, 'কালান্তর']

আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশে ধর্মের নামে অন্যায়কে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আজ চলছে। "এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না, তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব।" [বাতায়নিকের পত্র, ১, তদেব]

'বিসর্জন নাটকে বলিদানের বিরুদ্ধে, শক্তির বীভৎসতার বিরুদ্ধে, প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে নাট্যকারের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচার ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না: শাক্ত রঘুপতি ও প্রেমধর্মী গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে সংঘর্ষে এই বক্তব্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। জ্ঞানবর্জিত ও প্রেমবিহীন ধর্ম যে সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অন্ধ নিষ্ঠুর আচারে পরিণত হয়, ফলে মানবজীবনে মূঢ়তারই প্রতিষ্ঠা হয়, 'বিসর্জন' নাটকের এটাই মূল কথা। আমাদের ধর্মজীবনে মূঢ়তার আশ্রয়ে যে জয়সিংহের মতো কত মহৎ প্রাণের শোচনীয় বিসর্জন ঘটে, তার প্রতি নাট্যকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে ট্রাজেডি ঘটেছে, তা হল মহৎপ্রাণ ব্যক্তির ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম ও অনুষঙ্গী দুঃখের ট্রাজেডি। আর রঘুপতির ট্রাজেডি নির্মম আচার ও অহংকারের প্রতি আনুগত্যের ফলরূপ দুঃখলাভের ও হৃদয়ের বস্তু হারানোর ট্রাজেডি।

'মালিনী' নাটকেও (১৮৯৬) ধর্মবিরোধের ট্রাজেডি-আলেখ্য পাই। সনাতন ধর্মের বাহক ক্ষেমঙ্কর ও নব মানবধর্মের বাহিকা মালিনীর মধ্যে

যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে পড়ে সুপ্রিয়ের শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে—ফলে ক্ষেমঙ্কর হারিয়েছে তার প্রিয় বন্ধুকে, আর মালিনী তার প্রেমাস্পদকে। শাক্তধর্ম ও প্রেমধর্মের দ্বন্দ্ব এখানে নোতুন আধারে পরিবেশিত হয়েছে। প্রেমধর্ম হৃদয়ের ধর্ম এবং সে ধর্মই প্রকৃত ধর্ম—এই বোধের আলোকে নাটকটি আলোকিত হয়েছে। স্বর্গ মিথ্যা, দেবতা মিথ্যা, যজ্ঞ মিথ্যা, সত্য হল দয়া, ক্ষমা, প্রেম। তা-ই প্রকৃত ধর্ম। 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকে নাট্যকার হিন্দুসমাজের বিচারহীন মূঢ় ধর্মাচারকে সাহসের সঙ্গে আঘাত করেছেন।

'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শনকে প্রচার করেছেন। প্রেমহীন জ্ঞান, বিচারহীন কর্ম যে মানুষকে ছোট করে, তারই পরিচয় এ দুটি নাটকে বিধৃত হয়েছে। বোধ করি একথা বললে ভুল হবে না যে, রবীন্দ্র-নাটকের সমাজচিন্তা আসলে রবীন্দ্রমানসজাত দর্শনচিন্তার প্রতিফলন। ইয়োরোপের বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনচিন্তাকে উপনিষদের কবি কত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয়স্থল রবীন্দ্র-নাটক। জীর্ণ সমাজধর্মের প্রতি আনুগত্যে তা প্রকাশিত নয়, বিচারহীন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি ভীতিমিশ্রত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে তা ব্যক্ত নয়, সমষ্টিজীবনের অন্ধ মূঢ়তায় তা পর্যবসিত নয়। সমাজের অচলায়তনকে আধুনিক পৃথিবীর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন।

বিশ শতকের সূচনা থেকেই ইয়োরোপের জীবনে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে, প্রথম বিশ্ব সমরে তার প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ (১৯১৪-১৮)। গণতন্ত্রের প্রসার, সাম্রাজ্যবাদের রণহুঙ্কার, সাধারণ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, দুনিয়াব্যাপী বাণিজ্যিক সংকট, ঔপনিবেশিক শক্তির এশিয়া-আফ্রিকা অভিযান—এ পথের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপ পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। তার প্রতি পদক্ষেপে কর্মের উন্মাদনা, গতির নেশা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মবিস্তারের উত্তেজনা। আর আমাদের ভারতবর্ষ? তা বড়ো ক্লান্ত, বড়ো শ্রান্ত! মধ্যযুগের আত্মতুষ্ট কলহমুখরিত আচারবদ্ধ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আবদ্ধ। এই দুই বিপরীত জীবনের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ' প্রবন্ধগ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমাদের ভারতবর্ষ অচলায়তন—প্রাচীন সামন্ততন্ত্র। ধর্ম সেখানে পুথিতে আবদ্ধ, ব্যক্তি সমাজ-অনুশাসনের অধীন, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি সে রাজ্য থেকে নির্বাসিত।

'নৈবেদ্য'র কবির উপনিষদীয় শান্তি ভঙ্গ হয়েছে 'বলাকা' কাব্যে, গোঁড়া হিন্দু গোরার মোহভঙ্গ হয়েছে 'গোরা' উপন্যাসে, আর 'শারদোৎসব' নাটকের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে 'অচলায়তন' নাটকে। বস্তুত প্রথম বিশ্বসমরের সূচনা-লগ্ন কেবল ইয়োরোপের জীবনে নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও মুক্তিলগ্ন। 'বলাকা' কাব্যে তারই সোচ্চার ইঙ্গিত। পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনার দিন অবসিত, অজানা সমুদ্রপথে যাত্রার লগ্ন সমাসন্ন, ছোট সুখ ছোট তৃপ্তি ছোট শান্তির দিন অতিক্রান্ত, আজ মহৎ দুঃখ, মহৎ অশান্তি, মহৎ বেদনার দিন।

'অচলায়তন' নাটকের প্রেরণার পরিচয় দিতে গিয়ে নাট্যকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে —সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, নারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং বাহিরে সকল আঘাত সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব?… আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই; আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড় শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি বলিতেছি আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়েছি—সে শিকল আমার এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে—বাজিবে না তো কী? শিকল যে শিকলই, সেই কথাটা যেমন করিয়াই হউক জানাইতে হইবে।…ইহাতে যদি মার খাইতে হয় তো মার খাইব, তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না।"

'অচলায়তন' রচনার যে প্রেরণা এখানে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর অসহ্য হৃদয়বেদনাজাত। সাহিত্যসৃষ্টি যে নিছক খেলা নয়, অহেতুক

লীলা নয়, সুন্দরের ধ্যান নয়, তা যে সমাজজীবনের গভীর বেদনার প্রকাশ ও আকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপ, তা এখানে অকুণ্ঠভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। অমৃত সৃজনের মহৎ দায়িত্ব এই নাট্যকার গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর বক্ষে বেদনা অপার। সমকালীন সমাজ-পরিবেশ থেকেই 'অচলায়তন' নাটকের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। এই নাটকের নির্মোক রূপকের, আসলে তা জীবনের সত্য প্রতিরূপ।

'অচলায়তন' নাটকের ফলশ্রুতি 'গ্রন্থপরিচয়ে' ব্যক্ত হয়েছে: "আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন।" এই নাটকের প্রেরণা এসেছে সমাজস্পর্শহীন একক অধ্যাত্ম দর্শন থেকে নয়, তীক্ষ্ণ গভীর সমাজ-বীক্ষা থেকে। বদ্ধমূল জীবন-ধারণার বিপর্যয়জনিত বিস্ময়বোধ ও নোতুন চিন্তার অঙ্কুশাঘাত 'অচলায়তন'-পাঠককে সচেতন করে তোলে। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের ভিতরে যে কাঁকুড়ার বীজ ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আমাদের সমাজনীতি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থ-কলুষিত দুর্নীতিকে আশ্রয় দিয়েছে, সমাজের তথাকথিত উন্নত গুণাবলীর মধ্যেও যে অর্থনৈতিক শোষণের অলক্ষ্য প্রভাব দুষ্ট ব্যাধির মতো সংক্রামিত হয়েছে, এই আবিষ্ক্রিয়ার পরিচয়স্থল 'অচলায়তন'। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এত তীক্ষ্ণ নির্মম লেখনীতে সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন নি। রূপকের নির্মোক ছিঁড়ে ফেলে এই স্পষ্ট বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সে কারণেই 'অচলায়তন' নাটকের নিন্দায় একদিন সমাজপতিরা মুখর হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই দেখেছেন জড়তা, যান্ত্রিকতা, প্রাণের অভাব, সেখানেই তিনি আঘাত হেনেছেন। এই কথাটি স্মরণ রাখলে এইসব নাটকের বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্টতর ও সত্যতর হয়ে ওঠে। প্রাণহীন মিথ্যা আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 'বিসর্জন' নাটকে (১৮৯১)। অন্যায়ের সঙ্গে অবৈধ আপোষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৯)। এরপর 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান শুনতে পাই। এই সময়ে লেখা 'ডাকঘর' (১৯১২) ও 'তাসের দেশ' গল্পে [পরে নাটিকায় রূপান্তরিত] প্রাচীনের শৃঙ্খলভাঙার ডাক শুনি। 'ডাকঘরে'র ঘর প্রাচীন সমাজ—মুক্ত হাওয়ার পথ রুদ্ধ; কিন্তু কড়া শাসনে রেখেও অমলকে বেঁধে রাখা গেল না। আর 'তাসের দেশ' বিচিত্র নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজ। বাণিজ্যাভিলাষী বিদেশী

রাজপুত্র ইয়োরোপের মুক্ত জীবনের প্রতীক। সে এতদিনের প্রাচীন সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনল, জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। 'অচলায়তনের' প্রায় সমকালে রচিত 'বলাকা' কাব্য ও 'ফাল্গুনী' নাটকে (১৯১৬) আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচিয়ে তোলার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২২)। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা এখানে আরো প্রবল ও প্রখর হয়েছে। সমাজে মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই নাটকের জন্ম। ইয়োরোপের নব্য জীবনাদর্শের প্রতি নাট্যকারের অবিমিশ্র আনুগত্য এই নাটকে প্রকাশ পায় নি, এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'অচলায়তনে' প্রাচীন ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র-শাসিত সমাজকে পাই—সে সমাজে বিচারহীন আচার ও উপলব্ধিবিহীন মন্ত্রের যাদুতে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছে। 'মুক্তধারা'য় প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পররাজ্যলোলুপতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে জড়বাদী বিজ্ঞানের প্রাণবিরোধী শক্তির দম্ভকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। 'অচলায়তনে' পীড়নের বাহন ছিল শাস্ত্র ও পুরোহিত, 'মুক্তধারা'য় শোষণের হাতিয়ার বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যন্ত্র। সামাজিক মুক্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তি—দুয়ের আবেগই 'মুক্তধারা'য় শোষণের কঠিন পাথর ভেদ করে আপন পথ কেটে নিয়েছে। ইয়োরোপের নব্যজীবনাদর্শের প্রতি নাট্যকারের বিশ্বাস চলেছে, তিনি বাস্তবচেতন হয়েছেন, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই 'মুক্তধারা'য়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রবল প্রতিবাদ ও নিন্দায় রবীন্দ্র-নাথের একক কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ইংরেজের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হ'ল, এবং শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপান্তরিত হ'ল সাম্রাজ্যবাদী ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ কত সমাজচেতন ও রাজনীতিসচেতন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ 'মুক্তধারা'। বিজ্ঞানের দম্ভ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের চক্রান্ত ও মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা অস্বীকার-কারী যন্ত্রশক্তির স্পর্ধাকে নাট্যকার তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন। কেবল যন্ত্রসহায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাভব নয়, বিজ্ঞানশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে আধ্যাত্মিক শক্তির বিজয়ও নাট্যকার 'মুক্তধারা'য় দেখিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি

করেছেন, এ-ছাড়া মানুষের কল্যাণ নেই। যন্ত্রের প্রতিভূ মুক্তধারার বাঁধ ও যন্ত্ররাজ বিভূতি। সে যন্ত্র মুক্তধারার বাঁধ বেঁধে মানুষের তৃষ্ণার নীর, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেয়। সকল শক্তি ও বিভূতি সত্ত্বেও তা অশিব, তা বর্জনীয়। মুক্তির প্রতীক অভিজিতের মুক্ত প্রাণের বেগধারায় এই বাঁধ ভেসে যাবেই যাবে। মুক্তচৈতন্যের প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী শিব-তরাইয়ের অধিবাসীদের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে না পারায় সব ছেড়ে চলে গিয়েছে একক অধ্যাত্মসাধনায়, আর অভিজিৎ তার নিঃসঙ্গ অনুগামীহীন নেতৃত্বে আত্মোৎসর্গের দ্বারা যন্ত্রভেদ করল—বাঁধ ভেঙে দিল। অভিজিৎ প্রাণশক্তির প্রতীক, কিন্তু সে ধর্মবিচ্যুত নয়, ধর্মনির্ভর। এই ধর্মনির্ভরতা রবীন্দ্রনাটকে নোতুন ভাবনাবাহী।

রবীন্দ্রনাটকে সমাজচেতনার অগ্রগতির ধাপগুলি সহজেই চিনে নিতে পারা যায়। অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী (১৯২৬)—এই তিনটি নাটকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অচলায়তন ও মুক্তধারার রাজতন্ত্র প্রত্যক্ষ, রক্তকরবীতে রাজা নেপথ্যবিহারী। আধুনিক কালের ধনতান্ত্রিক সমাজের সকল ক্ষমতা যে কেন্দ্রে সংহত, তা মূলধন বা ক্যাপিটালের কেন্দ্র। রক্ত-করবীর রাজা তারই প্রতীক। অন্ধকার ভূগর্ভ থেকে সোনা তোলা হচ্ছে, সর্বশক্তিমান নেপথ্যবিহারী রাজা সেই কাজে সকলকে নিযুক্ত করেছেন। মুনাফাই তাঁর কাছে মুখ্য, জীবনে আর সবই তুচ্ছ। মুনাফার কাজে সাধারণ মানুষের সার্থকতা, এছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের আর কোনো সার্থকতা নেই। এই মুনাফালোভী নিষ্ঠুর ধনতান্ত্রিক সমাজনেতৃবর্গের বিরুদ্ধে দলিত মানুষের অভিযান রক্তকরবীতে রক্ত-আখরে লেখা হয়েছে।

শোষণজীবী যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণের বিজয় এই নাটকের মর্মকথা। ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার প্রতিনিধি রাজা, তিনি নেপথ্যবাসী; বাইরে তাঁর প্রতিনিধি সর্দার ও গোঁসাই, একের হাতে চাবুক, অপরের হাতে ধর্মের আফিম। আর শোষিত সমাজের অবরুদ্ধ প্রাণ-শক্তির প্রতিনিধি নন্দিনী। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ উৎপাদনের উপাদানমাত্র, তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মানবতার এই অপমান ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নন্দিনীর প্রতিবাদ। আলোহীন বাতাসহীন গানরিক্ত দুঃখভরা যক্ষপুরীতে নন্দিনী নিয়ে এল দুর্বার প্রাণবন্যা, শোষকের অত্যাচারের দুর্গ ভেঙে প্রতিষ্ঠা করল যৌবনকে—জীবনের আনন্দকে।

রক্তকরবী যুগধর্মী হয়েও যুগাতিক্রমী। পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা একালের ধনবাদী সমাজের সমস্যা রূপায়িত হয়েছে : আবার স্বর্ণলোভী শোষণজীবী সম্প্রদায়ের পরাজয় ও কর্ষণজীবী প্রাণশক্তির বিজয়ে আগামী কালের ইশারা পাই। 'রাজার সঙ্গে নন্দিনীর লড়াই যন্ত্র ও কৃষির মধ্যে লড়াই', এই সংগ্রামে কৃষির তথা প্রকৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'—গানের সুরে সমস্ত নাটকটি ভরে আছে; এখানেই নাটকের মর্মকথাটি প্রকাশিত।

রাজা-চরিত্র রবীন্দ্র-নাটকে ঘুরে ঘুরে এসেছে—প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, রক্তকরবী—এই তিন নাটকেই রাজার উপস্থিতি ঘটেছে। প্রায়শ্চিত্ত-এ প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে যে রাজাকে পাই, সে অ-মানুষ, ভূস্বামী, কৃষককুলের শোষক। মুক্তধারায় রণজিৎ-চরিত্রে যাকে পাই, সে রাজা যন্ত্রশক্তির সহায়—সাম্রাজ্যলোভী—বিজ্ঞান-শক্তির দম্ভে অধ্যাত্মশক্তি-উপেক্ষাকারী। আর রক্তকরবীতে যে রাজাকে পাই, তিনি শিল্পবিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদী সমাজের নায়ক—শোষণ তার একমাত্র সাধনা-ধনের দম্ভে সে অন্ধ—মানুষ তার কাছে উৎপাদন-সহায়ক মাত্র। প্রায়শ্চিত্তে রাজা কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের শোষক, মুক্তধারায় রাজা বাণিজ্যকেন্দ্রিক রাজ্যবিস্তারী সমাজের শোষক আর রক্তকরবীর রাজা শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের শোষক। এরা সবাই নিষ্ঠুর, আকর্ষণজীবী। এরা মানুষের আত্মপ্রকাশের পথে বাধা। সে-কারণে এই তিন নাটকে এদের বিরুদ্ধে অভিযান হয়েছে। মানুষের মুক্তি আসে এই বাধা অপসারণের পরে, এই সমাজচেতনা এগুলিতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু নাট্যকার এখানেই ক্ষান্ত হন নি। যে মানুষ শক্তিমত্ততায় অপরকে অগ্রাহ্য ও অপমান করছে, তারও মুক্তি চাই। সে মুক্তি বিকৃতি থেকে মুক্তি, জীবনের সহজ আনন্দে উত্তরণের মুক্তি। সে-কারণে রক্তকরবীর রাজাকে শেষ পর্যন্ত বাইরে আলো-হাওয়ার জগতে আসতে হয়েছে, প্রাণশক্তি নন্দিনীর কাছে নিজ বিকৃতিজনিত দৌর্বল্যকে স্বীকার করে নিয়েই তার হাত ধরে প্রাণের আনন্দ প্রার্থনা করতে হয়েছে।

রবীন্দ্র-নাটকে সমাজচেতনা পূর্ণতা লাভ করেছে পরবর্তী 'কালের যাত্রা' নাটিকার (১৯৩২) অন্তর্গত 'রথের রশি' একাঙ্কিকায়। অচলায়তনে অভিযান পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে, মুক্তধারায় ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে,

রক্তকরবীতে বৈশ্যশক্তির বিরুদ্ধে। বাকি রইল শূদ্রশক্তি। তার প্রতি নাট্যকারের কী মনোভাব?

এই প্রশ্নের উত্তর তথা সমাজচেতনার সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া গেল 'রথের রশি'তে। সমাজ এখানে জগন্নাথের রথ। রথের গতি আজ রুদ্ধ—অসাম্য অন্যায় অবিচারে পথ হয়েছে বন্ধুর। কোনো পূজোপচার বা মন্ত্রোচ্চারণে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একে একে আপন শক্তিদ্বারা রথ চালাবার চেষ্টা করল। তবু রথ চলে না। অবশেষে ডাক পড়ল অবজ্ঞাত অবহেলিত শূদ্রের। শূদ্র এসে হাত লাগাতেই পথের বাধা অপসৃত হল, রথের বন্ধনমুক্তি ঘটল, রথ চলল অসমতলকে সমতল করে, দেবালয় শস্ত্রালয় ধনালয়কে ভেঙে দিয়ে পথ কেটে নিয়ে জগন্নাথের রথ চলল শূদ্রের পুণ্যস্পর্শে। মানবসমাজের কালের যাত্রার সাংকেতিক কাহিনী 'রথের রশি'—ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ এখানে সমাজ সচেতন সত্যদ্রষ্টা-নাট্যকারের লেখনীমুখে ধরা পড়েছে। এই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাকল্প নাটিকার বিশেষ কোনো রূপ নেই, কাহিনী নেই, চরিত্র নেই, জাত নেই, দেশকালের স্পষ্ট পরিচয় নেই। পথ এর একমাত্র পটভূমি, অবহেলিত জনসাধারণ মুখ্য পাত্র, কাল এর অধিনায়ক। রথের যাত্রায় আগামী দিনের সমাজরূপ নাট্যকার প্রত্যক্ষ করেছেন। গত দু শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসের নানা ভাঙন-বিপ্লব-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা কি এই পথেই এগোচ্ছি না? 'রথের রশি'তে যে পথের কথা বলা হয়েছে, তা-ই কি রবীন্দ্র-সাহিত্য তথা দর্শনের মূলীভূত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নয়: লোকজীবনের প্রতি যে অনুরাগ এখানে ব্যক্ত হয়েছে, তা-ই কি রবীন্দ্রসাহিত্যকে অন্ত্য-পর্বে বিশ্বমানবতাভিমুখী করে নি?

এইসব প্রশ্নের উত্তরে এ-কথাই বলতে হয়, রবীন্দ্র-নাটকের সমাজচেতনা মানবমুক্তির উদারপথে আমাদের আহ্বান করে নিয়ে যায়, নির্বোধ প্রাণশক্তির জয় ঘোষণা করে, কালের মন্দিরাধ্বনি বাজিয়ে নিত্য পথ চলার প্রেরণা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

॥ ১ ॥

সত্তরে উপনীত রবীন্দ্রনাথের সামনে এক নোতুন শিল্পজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো—তিনি ছবির জগতে প্রবেশ করলেন এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর চিরকালের জন্য রেখে এলেন। কবির জীবনে রূপা শিল্পের জগতে এটি বিরল ঘটনা বলেই গৃহীত হবে। কিন্তু অদ্যাবধি রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর যথাযোগ্য আদর হয় নি। এর কারণ আমাদের চিত্রবিমুখতা ও প্রতিভার ব্যাপকতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। রবীন্দ্র-সংগীত কাব্যকলা বা নৃত্যনাট্য সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে, তার একাংশও রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে হয় নি। প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন, বাঙালি রূপান্ধ, রূপ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। বাঙালির রং-ছুট গান-ছুট জীবন রঙের ইন্দ্রজালে ছেয়ে যাক, এই আশা 'রূপের কথা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রকাশ করেছিলেন। সে আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নি, হোলে রবীন্দ্র-চিত্রাবলী কবির উদ্ভট খেয়াল বলে উপহসিত হোত না। বস্তুত এ'কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে রবীন্দ্র-চিত্র বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনা অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্র-সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যকলায় মানবমনের সকল অভিজ্ঞতা রূপলাভ করেছে—এ'কথা বলা ঠিক হবে না। এই সব ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি সুষমা, সামঞ্জস্য, সামগ্রিক সংহতি ও শান্তির ভক্ত। আর রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে মানবমনের অপর দিকটি প্রকাশ পেয়েছে—অবচেতনের উৎস থেকে ছবিগুলি রেখার ঝরণার মতো উৎসারিত হয়েছে—সে জগতে সুষমা নেই, শান্তি নেই, সামঞ্জস্য নেই, কিন্তু শিল্পলোকের শাসন আছে। মানবমনের একটি অপরিচিত এলাকায় অন্দরমহলের রঙ্গশালায় রবীন্দ্রনাথ এখানে আমাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। বিচার্য এই, এর জন্য আমরা কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছি?

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর প্রথম প্রদর্শনী হয় পারীতে ও বের্লিনে। তারপর বার্মিংহামে, ন্যুইয়র্কে। এদেশে প্রদর্শনী হয় আরো পরে—কলকাতায় (১৯৩২) ও বোম্বাইয়ে (১৯৩৩)।

পারী-প্রদর্শনীর পর পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখছেন—

বস্তুত আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে, এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে, আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে। শুনে আশ্চর্য ঠেকছে।

ঐ সময়ে অন্য একটি চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে লিখছেন—

আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি, আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকিনি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করি নি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হু হু করে এঁকে ফেললুম, আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে।......জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে গেল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।

বেলিন-প্রদর্শনীর পর ১৯৩০-এর আগস্টে শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে লিখছেন—

বোধ হয় আমার মনের ভিতরে একটা বৈরাগ্য আছে, আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই; এইজন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ, কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

['পথে ও পথের প্রান্তে', ৩১ সংখ্যা]

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা, অকুণ্ঠ প্রকাশ ব্যাকুলতা, দুঃসাহসিকতা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতা এই তিনটি উদ্বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে রসের শাসন ছাড়া আর সব গুরুগিরিকে শিল্পী এখানে অস্বীকার করেছেন। শিল্পে জাতীয়তাবাদ বর্জনীয়, একথা রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে বলেছেন। বিংশ শতাব্দে ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা মনকে আল দিয়ে বেঁধে রাখার প্রয়াস মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধতার পরিচায়ক। তার বিরুদ্ধেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, ছবির কোনো ভূগোল নেই, নেই কোনো পিছুটান। 'ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না', 'আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়', 'আমি সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও', 'এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করেছি'—এইসব উক্তির মধ্য দিয়ে যে বাঁধ-ভাঙা মুক্ত শিল্পীমানসের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি অদ্যাবধি আমরা দিতে পারি নি।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাই প্রথমেই এ'কথা স্বীকার্য যে তিনি কয়েকটি বাঁধা-ধরা আঙ্গিক ও রূপ-লক্ষণের শৃঙ্খলে ছবিকে বেঁধে রাখতে চান নি, রেখা ও রঙের জগতে মুক্তি দিয়েছেন। আঙ্গিকের অচল স্থাণুত্ব থাকতে পারে না, কেননা আঙ্গিক আসবে রূপের ধারণা থেকে যার উৎস মন। রূপের অনুযায়ী আঙ্গিক বিচিত্র হবে, শিল্পী সৃষ্টির প্রয়োজনে যেমন উপাদান সংগ্রহ করবে প্রত্যক্ষ পৃথিবীর সবত্র থেকে, তেমনি সৃষ্টির প্রয়োজনে আঙ্গিকও গ্রহণ করবে বিশ্বের শিল্প-জগৎ থেকে। তাই ভারতীয় চিত্র-কলা নামক শিল্প-অচলায়তনের সংস্কারবদ্ধতাকে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন। 'ভারতীয় শিল্প' এই লেবেল-মারা কিছু সৃষ্টি করতে তিনি শিল্পীদের নিষেধ করেছেন এবং দাগ-মারা-জন্তুদের মতো একই খোঁয়াড়ে বন্দী না হতে শিল্পীদের প্ররোচনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"I strongly urge our artists vehemently to deny their obligation carefully to produce something that can be labelled as Indian art according to some world mannerism. Let them proudly refuse to be herded into a pen like branded beasts".

['The Meaning of Art']

শিল্পকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সংক্ষেপে এই—শিল্প আত্মার প্রকাশ। শিল্পী-আত্মা নিজেকেই প্রকাশ করেন শিল্প-মাধ্যমে। এ তার আত্মার আনন্দ-প্রকাশ। তাই স্বভাবতই তা কোনো বিশেষ দেশ-কাল-অর্থের নিগড়ে আবদ্ধ নয়। সৌন্দর্যের কোনো সর্বকালস্বীকৃত অচল অনড় ধারণা থাকতে পারেনা। তা পরিবর্তমান, মানবমনের নিয়ত পরিবর্তমান প্রকাশব্যাকুলতার মাধ্যমে। শিল্প বা আর্ট সে-কারণেই সৌন্দর্য বা বিউটির সঙ্গে কোনো বিশেষ অর্থে বিশেষ পটভূমিতে যুক্ত নয়। সৌন্দর্য সম্পর্কিত প্রথাসিদ্ধ ধারণার পোষকতা করা শিল্পের ধর্ম নয়, শিল্পীর সাধনা নয়।

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্র-ভারতীকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এখানেই তিনি 'ভারতীয়'-মার্কা শিল্পসৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন, নিজেকে কেবল বাংলাদেশের নয়, ইয়োরোপেরও মানুষ বলেছেন।

ছবির উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অবচেতন ও প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকের বাসিন্দা ("Art belongs to the region of intuition, unconscious, the superfluous.")। রূপের উদ্দেশ্য কি—এই প্রশ্নে তিনি বলেছেন—রূপের ছন্দময়তাতেই রূপের চরম প্রকাশ ("The rhythmic significance of form which is ultimate")। রূপই রূপের উদ্দেশ্য।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ছবির ক্ষেত্রে Objective Expressionism-এ বিশ্বাস করতেন। তিনি সেকারণেই দেশ-কাল-রুচির গণ্ডীতে বাঁধা থাকতে একেবারেই চান নি।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি এসেছে তাঁর অন্তরের অন্দর-মহল থেকে, সে মহল অবচেতন মনের মহল। সেখানে কোনো চেতন বাছাই নেই, সচেতন মনের রুচির শাসন নেই, সেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অবচেতন একমাত্র নিয়ামক। রবীন্দ্রনাথের ছবি ঘটনার প্রতিরূপ নয়, কেননা ফোটোগ্রাফির নকলনবিসি করা শিল্পীর কাজ নয়। ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ স্বাধীনতার (Absolute freedom) পক্ষপাতী, তাই শিল্পীর অন্তরের অন্দর-মহলে যে ছবির জন্ম হয় সে ছবি বাহির-প্রকৃতির দাস নয়। ছবি পৃথিবীর অসংখ্য রূপের প্রতিরূপ নয়। নিজেই একটি রূপ। সে রূপ নিজেকেই প্রকাশ, তা ultimate। তার উৎস অবচেতন মনের সমুদ্র-তল। সেখানে রূপ প্রথম ও শেষ কথা, সেখানে

নেই বুদ্ধির খেলা, নেই সংস্কারের শাসন, নেই দেশকালের ভ্রূকুটি। রবীন্দ্রনাথের ছবি, সংক্ষেপে বলি, অবচেতনের উৎস থেকে ঝরণার মতো উৎসারিত হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় চিত্রকলারীতির সঙ্গে এই ছবির কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আজ পর্যন্ত পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নি বলেই আমরা শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছি।

শেষ বয়সের এই অপূর্ব বিচিত্র সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় বলেছেন। তিনি বলেছেন—

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী, ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না। [শেষ সপ্তক]

আর-একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছবির সম্বন্ধে বলছেন—

ঘটনার ডাক-পিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।
জগতে রূপের আনাগোনা চলছে
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়। [শেষ সপ্তক]

পুনরপি অপর একটি কবিতায় কবি কৌতুক ক'রে আলেখ্যকে বলছেন—

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে-সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দা প্রশংসার।

এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।

[পরিশেষ]

রবীন্দ্র-চিত্রের যে আলোচনা উপরে করেছি, এই তিনটি কবিতাংশের দ্বারা তার পোষকতা হয়। রেখার নিঃশব্দ জগতে অর্থ নেই, ধ্বনি নেই—যদিচ লেখার জগতে অর্থ ও ধ্বনির শাসন এড়ানো যায় না। রেখা স্বয়ংসম্পূর্ণা, রূপের উদ্দেশ্য রূপ, এ'ছাড়া আর কোনোও অর্থ নেই। শব্দহীন রেখা অর্থকে প্রকাশ করে না, অর্থহীন রূপকে প্রকাশ করে। সেখানে সম্বল অবচেতন মনের অনুভূতি ও আনন্দ। রেখার জগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যই তাঁর চিত্রাবলীতে অপূর্ব শিল্প রচনা করেছে।

আশা করি এতক্ষণে এ'কথা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি যে, রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণসম্মত 'ভারতীয়' চিত্রকলারীতির কোনো সম্পর্কই নেই। এবং এর উৎস অবচেতন মনের সমুদ্রতল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগতের চিত্রকলার ইতিহাসে কোথাও কি এর সমর্থন পান নি? আমার মনে হয়, তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন জর্মান চিত্রকলায়। আর একথাও এখানে স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের ছবি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছিল জর্মানিতে। রসিক শিল্পবোদ্ধাদের চিন্তার খোরাক দিতে পারে এই সমর্থনের দেশ-কাল। তাঁদের বিবেচনার জন্য আমার ধারণা লিপিবদ্ধ করছি।

প্রথম বিশ্বসমরের আগে-পরে জর্মানিতে চিত্রকলায় যে নব আন্দোলন উপস্থিত হয়, তার অভিধা এক্সপ্রেশনবাদী আন্দোলন (Expressionist Movement)। এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত শিল্পীরা দুটি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এ দুটির নাম—Der Blaue Ricter এবং Die Broke।

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে জর্মান চিত্রকলাকে কেন্দ্র ক'রে এই এক্সপ্রেশন মতবাদ ও আন্দোলনের প্রসার ঘটে ইয়োরোপের সাহিত্যে দর্শনে। বিষয়বস্তুর মৌল স্বরূপকে প্রকাশ করাই এই মতবাদের অন্বিষ্ট। দৃষ্টির সম্মুখে যা প্রতিভাত হয়, তার চেয়ে দৃষ্টির অন্তরালে যে মৌল রূপটি বর্তমান, তাকেই প্রকাশের সাধনা এক্সপ্রেশনবাদীদের সাধনা। এই মতবাদ কেবল চলমান চিত্রকলার বিরুদ্ধে নয়, বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও এর প্রবল বিদ্রোহ। এই মতবাদ বিশ্বাস করে, বর্তমান সভ্যতার প্রসাধন-করা আননের অন্তরালে রয়েছে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। যা বাহিরে প্রকাশিত,

তা বস্তুর সত্যরূপ নয়, ছলনা মাত্র। এক্সপ্রেশনবাদ এই ছলনা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এবং সে-কারণেই এক্সপ্রেশনবাদী শিল্পী অঙ্কন-যোগ্য বিষয়ের মূল কাঠামোর বাহ্যরূপকে বিকৃত করে দেখান। এক্সপ্রেশনবাদী চিত্রকলা তাই গতিশীল, দুঃসাহসীরূপে স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং সময় সময় বিভ্রান্তিকর।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এই সব লক্ষণই বর্তমান। আশ্চর্য নয় যে বেলিনে রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনীতে জর্মান কলাসমালোচকরা জর্মান এক্সপ্রেশনবাদী চিত্র-কলার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং Kandinsky, Christian Morgenstern, Nolde. Edvard Munch, Paul Klee ও Kubin-এর চিত্রশৈলীর সমর্থন লক্ষ্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, ইয়োরোপে এক্সপ্রেশনবাদী চিত্রকলার প্রবর্তক হলেন নরোয়ের শিল্পী Edvard Munch (1863-1944); জর্মান চিত্র আন্দোলন এঁর কাছে সবিশেষ ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি যে Objective Expressionism-এর পথিক, তার পরিচয়স্বরূপ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য উদ্ধার করি। তিনি বলছেন :

> তাঁর নানা প্রকার প্রাণীর চেহারাগুলি সবই বাস্তব জীব-জন্তুর থেকে তফাৎ। কারণ শিল্পীর চোখ এইসব জীবের দেহের চেহারাকে এড়িয়ে ভাবের আকৃতিকেই দেখতে পেত। এমনি করেই তাঁর বাঘের ছবিতে ফুটে উঠত হিংসার লোলুপতা। আসলে বাঘের দৈহিক ভঙ্গিকে অবলম্বন করে হিংসা ও লোভের গ্রাসকেই তিনি আঁকতেন। তাই বাস্তবিক বাঘের চেহারার সঙ্গে তার মিল না থাকলেও, ছবির রেখায় বাঘের চরিত্রের দাগ মুদ্রিত হলো। তাঁর আঁকা মস্ত বড়ো একটা মহিষের মতো জন্তুর আকৃতির মধ্যে প্রকৃতির একটা আদিম শক্তির চেহারা যেন বেরিয়ে আসে যাকে মাদাম ন্ত নোয়াই বলেছেন, 'ক্ষুধিত মোহগ্রস্ত অভিশপ্ত জীব।' সেটাকে নাম দিতে গেলে হয়ত বলব, হিপোপটেমাস বা আর কিছু; কিন্তু ওটি তাঁর নিজের তৈরি জিনিস। প্রকৃতির গড়া জিনিস এখানে শিল্পী নকল করেন নি, তিনি করেছেন মনের মতো সৃষ্টি।"
>
> [বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র-চিত্রকলাকে আজো আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিই নি, এমন কি উপহাস করেছি। আর যা বুঝেছি তা ভুলে ভরা। অনেক সময় মনে হয়, কিছু না-বোঝা ভুল ব্যাখ্যার চেয়ে কাম্যতর। রবীন্দ্র-চিত্রাবলী সম্পর্কে আমাদের দেশে যে-সব আলোচনা হয়েছে, তা মুক্ত মনের পরিচায়ক নয়। জর্মানি ও ফ্রান্সে রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর যে সমাদর হয়েছে, তার পিছনে ভাব-গদ্গদ আতিশয্য নেই, আছে সহমর্মিতা—যার একান্ত অভাব লক্ষ্য করি আমাদের দেশে।

বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-চিত্র সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' (প্রথম সংস্করণ : ১৯৪১খ্রীঃ)। অদ্যাবধি দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি যদিচ এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় ইদানীং বহু আলোচনা হয়েছে। এর দ্বারাই আমাদের অনুৎসাহ প্রমাণিত হয়। প্রথম প্রয়াসরূপে এই গ্রন্থ অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য, কিন্তু এতে এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যার সমর্থন করা যায় না। গ্রন্থ-সূচনায় 'রবীন্দ্রনাথের কলাচর্চা' নামক প্রবন্ধে ও শেষ প্রবন্ধে শ্রীগুপ্ত এক কথা বলেছেন—"Great art is an unconscious creation—উঁচুদরের কলাসৃষ্টিকে বলা যায় অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি,—স্রষ্টা, তাঁর স্রষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, অনবহিত।"

এই অভিমত সর্বাংশে গ্রাহ্য নয়। কি তত্ত্বের বিচারে, কি ঘটনার বিচারে এই অভিমত সমর্থন করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবসৃষ্টি সম্পর্কে 'নির্লিপ্ত, অনবহিত' ছিলেন, একথা যথার্থ নয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাংশগুলি উদ্ধার করেছি তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন না, পরন্তু বাংলা দেশে তাঁর ছবির সমাদর হয় নি, অথচ ইউরোপে আমেরিকায় হয়েছে, এ-কারণে তিনি তাঁর ছবিগুলি 'পশ্চিমের হাতেই দান' করেছিলেন। প্যারী, বার্লিন, বার্মিংহাম, ম্যুইর্কে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর সমাদরে তিনি বিশেষ খুশি হয়েছিলেন, সেই খুশিই নানা পত্রে ব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়া, তিনি কি এ-ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না? নিশ্চয়ই ছিলেন। The Meaning of Art নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে ও 'Chitralipi 2' এ্যালবামের সূচনায় যে-কথা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে নোতুন পথে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রথমাংশে 'The Meaning of Art' গ্রন্থের যে তিনটি মন্তব্য উদ্ধার করেছি তা থেকেই প্রমাণিত হয়, তিনি প্রথাসিদ্ধ 'ভারতীয়' চিত্রকলারীতির বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তা নিতান্ত 'অপ্রবুদ্ধ' ব্যাপার নয়।

রেখার জগৎ সম্পর্কে তাঁর যে স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং ছবির ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার উপর আস্থা ছিল, তার প্রমাণ আগেই উদ্ধার করেছি। শিল্পক্ষেত্রে 'absolute freedom' আর 'unconscious creation' এক ব্যাপার নয়, তা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ জানতেন। অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে যার উৎপত্তি, তার প্রকাশ কখনোই অবচেতন নয়। শান্তি সুষমা সামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের লিখিত সাহিত্যের মূল কথা। আর অবচেতন মনের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রেখা-জগতের প্রস্থানভূমি। লেখার জগতে শিল্পী অর্থ ও ধ্বনির শাসনের অধীন, কিন্তু রেখার নিঃশব্দ জগতে অর্থ নেই, ধ্বনি নেই, তা অর্থহীন রূপকে প্রকাশ করে—এ'কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। তাই রেখার জগতের এই স্বাধীনতার প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এব্যাপারে অপ্রবুদ্ধ ছিলেন, এই মত গ্রাহ্য নয়।

দ্বিতীয় যে অভিমত রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্পর্কে শোনা যায় তা হলো—এই সব ছবি অবদমিত মনের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। এই মতের প্রবক্তা মিঃ আচার। পরে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'সাহিত্যচিন্তা' গ্রন্থে এর সমর্থন করেছেন। এই অভিমতের মূল কথা হলো, রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে-সব বাসনা দমিত হয়ে ছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যে যার প্রকাশ ঘটে নি, সেগুলি চিত্রের অনুকূল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। গূঢ়ৈষণা, অবদমিত ইচ্ছা ও অন্তর্গূঢ় বাসনার প্রকাশস্থল রবীন্দ্রচিত্রাবলী। এই মত ভ্রান্ত কেননা এতে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় মানুষের যৌন-এষণাকে সকল কর্মের মূলাধার মনে করা হয় এবং এই বাসনাকে অবদমিত রাখার সচেতন প্রয়াস মানুষ করে; কিন্তু এই অবদমিত বাসনা সর্বদাই প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করে।

এই একদেশদর্শী মত কখনোই সামগ্রিক জীবনসত্যের পরিচায়ক হতে পারে না। যে অন্ধকার, বিশৃঙ্খলা, সামঞ্জস্যহীনতা ও বৈষম্য রবীন্দ্রচিত্রাবলীতে প্রকাশিত তা অবদমিত বাসনার বহিঃপ্রকাশ কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। রবীন্দ্রসাহিত্যে যে শান্তি ও সংস্থিতি, আলো ও সুষমার প্রকাশ, তা জীবনের সমগ্র আলেখ্য নয়, এ'কথা স্বীকার্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্ধকার,

বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা অবদমিত বাসনার প্রকাশ। বরং এ'কথা বলাই সঙ্গত যে, অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে উত্থিত যে-সব 'ইমেজ' রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে রঙে-রেখায় ধরা পড়েছে, তা সৃষ্টির—মানবমনের ও জগতের আদিম যুগের শিল্প-রূপায়ণ। আর যে মুহূর্তে রঙরেখার বন্ধনে এই সব ছবি ধরা পড়েছে, সেই মুহূর্তেই তা রসের শাসন, শিল্পের সংযমকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ও শিশু পৃথিবীর যে অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে দেখি, তা এই সত্যের প্রমাণস্থল। তাই এ'কথাই বলা উচিত হবে যে, অসম্পূর্ণ ভাঙা-চোরা খাপছাড়া সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রের মতো সম্পূর্ণ, সভ্য ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে যে জগৎকে পাই, সে জগৎ অবদমিত যৌবনবাসনার জগৎ নয়, তা জগৎসৃষ্টির প্রাথমিক রূপের অতি-পরিণত শিল্পরূপ। এই শিল্পরূপের ভ্রান্ত বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা মহত্তম শিল্পপ্রতিভার অবমাননা করতে পারিব না, নিজেদেরই হীনতা প্রকাশ করব। সাহিত্য ও সংগীত রবীন্দ্রনাথের বিরাট আনন্দানুভূতি ও প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে যথেষ্ট বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয় নি বলে তিনি ছবির জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

আপত্তি উঠতে পারে যে রবীন্দ্র-চিত্রলোক ছন্দহীন, শৃঙ্খলাহীন ও খাপছাড়া। সামাজিক ও বাহ্যিক শৃঙ্খলাবোধের সংস্কারে আমরা আবদ্ধ বলেই এই আপত্তি। অন্যথায় গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ চিত্রলোকের বিদ্রোহী প্রমিথীয়ুস। তিনি আলোর সন্ধানী। সে আলো কেবল নিয়মমানা সংস্কারবদ্ধ শিল্পের আনন্দ নয়, সে আলো রঙ-রেখার জগতে সৃষ্টিছাড়া পাগলের প্রলয় নৃত্য। শিবের তাণ্ডব নৃত্যেও ছন্দ আছে, রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও সেরূপ ছন্দ রয়েছে। 'ভারতীয়'-মার্কা শিল্পসৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ও দাগ-মারা জন্তুদের মতো একই খোঁয়াড়ে বন্দী না হতে তরুণ শিল্পীদের প্ররোচনা দিয়েছিলেন, সে-কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ শিল্পীধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, শিল্পরীতির অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লেখনীর নটনলেখায় রেখায় রেখায় আলেখ্য অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থ ও ধ্বনির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে রেখার জগতে রবীন্দ্রপ্রতিভা জীবন-সায়াহ্নে এক নোতুন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতেছিলো, রবীন্দ্রচিত্র সম্পর্কে এ'কথাই গ্রাহ্য।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রচিত্রপ্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, তার দ্বারা আমরা এই ধারণার সমর্থন পাই। তিনি বলেন,—

> রবিকা'র ছবিতে যা আছে তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে সব রঙ নিয়ে উনি কারবার করেছেন নেচারে সে সব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন,—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকা'র ছবিও এসব থেকেই হয়েছে। তাকে নতুন বল্‌ব কোন হিসেবে? সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকা'র ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন—আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে। কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হোলো। অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে। অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রং রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকোনো সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে। এই যে একটা volcanic ব্যাপার—এ থেকে শিখতে পারবে না, হবে না তা। ভল্‌কানিক ইরাপ্‌শনের মতো এই একটা একটা জিনিস হয়ে গেছে। এ থেকে আর্টের পণ্ডিতেরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে আমার তা মনে হয় না। ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলো না, গানে হোলো না—শেষে ছবিতেও ফুটে বের হতে হোলো—তবে ঠাণ্ডা।
>
> [বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯]

তৃতীয় যে অভিমত প্রচলিত আছে, তা হলো রবীন্দ্রনাথের ছবি-আঁকা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, হঠাৎই একদা তিনি খেয়ালের বশে এলোমেলো ছবি আঁকলেন। এই মতের নির্গলিতার্থ—ছবিতে রবীন্দ্রনাথের অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। এই বক্র মন্তব্যে রবি-প্রতিভার অপমান করা হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অভিমতের প্রবক্তা শ্রীযুক্ত যামিনী রায় ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যপত্রে' শ্রীযুক্ত রায়ের, ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের 'বসুধারা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দে-র প্রবন্ধে এই অভিমত প্রচারিত হয়েছে। শেষোক্ত পত্রিকায় 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দে লিখেছেন, "সেই প্রবন্ধে [১৩৫৮, 'সাহিত্যপত্রে'

প্রকাশিত] যামিনীবাবু বলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। ......আমার মতে গত দু শ' বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান: ছবির জন্ম খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া। তাঁর প্রতিবাদ গোটা সৌখিন ভারতীয় শিল্প, প্রাচ্যশিল্পবাদ সবের বিরুদ্ধে।"

এই অভিমতে দুটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। "সৌখীন ভারতীয় শিল্প', 'প্রাচ্যশিল্পবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা শ্রীযুক্ত রায় বলেন নি। এই 'লেবেলে'ই আপত্তি আছে। 'সতেজ শিরদাঁড়া' বলতে তিনি 'ছন্দ গঠনের জোর'কেই বুঝিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পে 'ছন্দ গঠনের জোর' ছিল না—এই মত গ্রাহ্য নয়। সংস্কারানুগত্য ও প্রথানুকরণের ফলে 'ভারতীয়' শিল্পরীতি প্রেরণা-নিঃশেষিত হয়ে গেছিল, অবনীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ এরই বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ এই পথ বর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি ছবিতে সৃষ্টির যে প্রাথমিক রূপটিকে রঙে রেখায় মুক্তি দিয়েছেন, তার উল্লেখ এই অভিমতে নেই।

তা ছাড়া, 'শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল না—এই মন্তব্যটি পরীক্ষাযোগ্য।

এই অভিমতের অর্থ শিল্পক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অশিক্ষিত-পটুত্ব,—এই অভিযোগের স্বীকৃতি। এবং তার অর্থ রবি-প্রতিভা সম্পর্কে নীচু ধারণার পোষকতা।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে বহুদিনের সযত্ন শিক্ষা, আয়াস ও সাধনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের কি সে শিক্ষা ছিল না? ছিল, রঙে রেখায় রূপের ছন্দময়তাকে প্রকাশের জন্য অত্যাবশ্যক প্রাথমিক সাধনা তাঁর ছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভা কোনো ক্ষেত্রেই আকস্মিকভাবে একদিন উর্বশীর মতো 'বৃন্তহীন আপনাতে আপনি বিকশিত' হয় নি। রবি-প্রতিভার পিছনে নিরলস পরিশ্রম, ব্যর্থতা, আয়াস, আংশিক সাফল্য, পুনরপি আয়াস ও তারপরে পরিপূর্ণ সাফল্যের স্তরগুলি সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কি গদ্যে, কি কবিতায়, কি নাটকে, কি গানে এই স্তরগুলি বর্তমান; ছবির ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

পঁচিশ বছর থেকে সাতষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার নানা প্রয়াস করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর পত্রাবলীতে ও পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। বহুদিন ধরে নিজের লেখার কাটাকুটির উপরেই কলম চালিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রেখাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল, শেষে রঙের ব্যবহার করেছেন নানা পরীক্ষার মাধ্যমে। আর অভিনেতা, প্রযোজক ও নৃত্যনাট্য-গীতিনাট্য রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কি মঞ্চে ছবির প্রতিভাস খুঁজে পান নি ?

এই বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি বিবরণ এখানে উদ্ধার করছি।

(ক) "মনে পড়ে দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা, তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।" ['জীবনস্মৃতি' ১৩১৯ বঙ্গাব্দ]

(খ) "ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি।" ['ছিন্নপত্র', ১৩০০ বঙ্গাব্দে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রাংশ]

(গ) "শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি।" [আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা পত্রাংশ, ১ আশ্বিন ১৩০৭]

(ঘ) "আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। ··· আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি, তাতে ··· রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।" [শ্রীযুক্তা নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রাংশ, ২১ কার্তিক ১৩৩৫]

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে এ'কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ আজীবন চিত্রবিদ্যার সাধনা করেছেন। ফললাভ করেছেন সত্তরে উপনীত হয়ে। এছাড়া 'লেখন' (১৩৩৪ ॥ ১৯২৭), 'খাপছাড়া' (১৩৪৩ ॥ ১৯৩৭), 'সে' (১৩৪৪ ॥ ১৯৩৭)—এই তিনটি গ্রন্থে রঙ ও রেখার ব্যবহার কবি করেছেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত দু হাজারের বেশি ছবির মাত্র কয়েকটি নির্বাচিত ছবি 'চিত্রলিপি [১]' (১৯৪০) ও 'Chitralipi —2' (১৯৫১) নামক দুটি অ্যালবামে সংগৃহীত হয়েছে। অক্ষর-লিখন-শিল্পের (Calligraphy) খেয়ালী চর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রেখার সবলতা,

সুষমা, ক্ষিপ্রতা, কোমলতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌকুমার্য আয়ত্ত করেন, তারপর রঙ নিয়ে খেলতে শুরু করেন এবং তার ফলে আমরা পেলাম রবীন্দ্র-চিত্রাবলী।

॥ ৩ ॥

এইবার রবীন্দ্র-অঙ্কিত আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য উদ্ধার করি—

> "যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলুম। দেখলুম গাছের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীব-জন্তুর মূর্তি। আগে তা দেখি নি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে-ডালে ফুল ফুটল—এই সব। এ একেবারে নূতন ধরণের দেখা। কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মূর্তি কে দেখালে? আর্ট দেখালে। সে বললে, এ অস্তকেও দেখাতে। এই যে দেখার সম্পদ, এ চারি দিকে বিস্তার করে এসেছে মানুষ। কেন বলে ওঠো—'বা'! সুন্দর বলে নয়, দেখবার বলেই। এইটে হচ্ছে আমাদের আর্ট। দৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিচ্ছে। যা দেখে নি, তাকে যখন দেখে—অবাক হয়ে যায়। এই জন্যেই তো প্রত্যক্ষ দেখার এত আনন্দ। 'এই যে দেখা, এ-হচ্ছে ছবির দেখা।"

রূপের উদ্দেশ্য রূপদর্শন, আর কিছুই নয়। রূপদর্শনের এই মোহাঞ্জন চোখে না লাগাতে পারলে চিত্রলোকে রূপাবিষ্কারের আনন্দ আমরা পাবো না, এই সতর্কবাণী স্মরণে রেখেই রবীন্দ্র-চিত্রাবলী দেখি। অর্থ ও ধ্বনির শাসন থেকে মুক্ত হয়েই এই আলেখ্যদর্শন করা যায়, রঙ ও রেখার স্বতন্ত্র জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেই একে উপভোগ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রকরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীরা যা বলেছেন, তা থেকে এই প্রতিভার নোতুন পরিচয় পাই। ছবি আঁকার জন্য যে কোনো কাগজ হলেই তাঁর চলে যেতো। এ বিষয়ে তাঁর কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। সব রকমের রঙ ও কালি তিনি ব্যবহার করেছেন। নানা রঙের ফুলের পাপড়ি নিঙড়ে রঙ বের করে তা দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন। আলমোড়া বাসকালে কুমায়ুনের দেশী রঙ নিয়েও কাজ করেছেন। ছবির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ নারিকেলের তেল, সরিষার তেল ব্যবহার করেছেন।

একাসনে বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক একখানা ছবি তিনি এঁকে শেষ করতেন—খুব বেশি হোলে সময় লাগত এক ঘণ্টা। তুলি বা কলমের অকম্পিত ক্ষিপ্র টানের পর টানে অঙ্কনকর্ম এগিয়ে যেতো। বস্তু-বিন্যাসে শিল্পী নির্ভুল জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সময় তুলির এক টানেই একটা ছবি শেষ করেছেন।

কম্পোজিশনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রেখা ও রঙ—দুয়ের ব্যবহারেই শিল্পী দুঃসাহসিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ছবিগুলির 'ফিগারে' অসাধারণ দৃঢ়তা এসেছে ক্ষিপ্র গভীর রেখার টানে। প্রধানত কলম দিয়েই তিনি রেখা এঁকেছেন। ছবিতে রঙ দিয়ে আঁকা অংশকে কালো কালির মোটা মোটা সুস্পষ্ট রেখা টেনে পৃথক করে নিয়ে সেই খালি জমিতে রেখার পর রেখা টেনে সেটাকে তিনি ভরিয়ে তুলেছেন। সবটা মিলিয়ে আলঙ্কারিক নক্‌শা।

আর রঙের ব্যবহারে শিল্পীর আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখে চিত্রসমালোচকের দল বিস্মিত হয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পী গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছেন। রক্তাভ, পিঙ্গলাভ, পীতাভ, হরিদ্রাভ রঙের ব্যবহার করা হয়েছে কালো পট-ভূমিতে। রঙ-ব্যবহারের আশ্চর্য কৌশলে বৈপরীত্যের 'এফেক্ট' চমৎকার ফুটে উঠেছে। ঘনগভীর রঙের পটভূমিতে হলুদ বা পাটকিলে রঙে আলোর আভাস ফোটানো হয়েছে। ফলে মৃদু আলোয় ছবির অবয়ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রঙের মধ্যে শিল্পী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন জল-রঙ। খুব গাঢ় রঙের প্রলেপ ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ ছিল। ছবি আঁকার সময় শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মন এত দ্রুত চলতো, অঙ্কনপ্রেরণা এত তীব্র হয়ে উঠতো যে তাঁর হাতের কলম বা তুলি তাঁর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারতো না। কলম বা তুলির স্বচ্ছন্দ-ব্যবহারের মধ্য থেকেই শিল্পীর অবচেতন মনের ভাণ্ডারের কোনো রূপ তাঁর চেতন মনে ভেসে উঠতো, এবং সে মুহূর্তেই তাকে রঙে-রেখায় ধরে না ফেলা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত মুকুল দে, শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর ও শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, শিল্পী খুব দ্রুত ছবি আঁকতেন।

এখানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য নেওয়া যায়। তিনি বলতেন—

> "ছবিতে আমার একটা বেশ মজা আছে। আমি তো ছবিতে একই বারে রং দিই না। আগে পেন্‌সিল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রং

তৈরি করি মানানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। তাতে করে হয় কি—রংটা বেশ একটু জোরালো হয়।······আমার হচ্ছে—যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোল, তাই আঁকলুম, মনের সঙ্গে রং তুলি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে আমার ছবি।······আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে—'বেশ সুন্দর হয়েছে', তখনি আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি করে তার একটা রূপ বের হয়। আমি মানুষের জীবনটাও এমনি করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে যায়—একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে, তার পরে মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনই তার একটা সত্যিকার রূপ হয়।'

—['আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'—শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ, দিনলিপি ১১।৭।৩৯]

এ তো হলো ছবির আঙ্গিক-প্রকরণের কথা। কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর বক্তব্য কি? ছবির নাম কি? ছবির উদ্দেশ্য কি?

এই প্রশ্নের জবাবে শিল্পী নিজেই বলেছেন,

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে।······জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না।

তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন, বা নেবেন, তাঁরা অনামীকে নিজেরাই নাম দান করুন।······রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তার পরে নামসৃষ্টি অপরের।"

—[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাংশ, ২ পৌষ ১৩৩৮]

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, ছবির কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়।—

"People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain."

অতএব রবীন্দ্র-চিত্রলোকের পরিচয় শিল্পীর কাছে দাবি করলে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে। পূর্বে যে সতর্কবাণী স্মরণ করেছি, তা পুনর্বার স্মরণ করে আলেখ্যদর্শন করা যাক্। রূপের উদ্দেশ্য রূপ দর্শন, আর কিছুই নয়। ("The rhythmic significance of form which is ultimate"—Tagore, 'The Meaning of Art')।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্র-চিত্রাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) মানুষের প্রতিকৃতি, (২) জীবজন্তুর ছবি, (৩) প্রাকৃতিক দৃশ্য। মোট ছবির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার, এর মধ্যে দেড় হাজারের বেশি ছবি মানুষের প্রতিকৃতি।

ছবিগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)।

রবীন্দ্র-চিত্রলোকে প্রবেশ করলে মনে হয় এ যেন স্বপ্নের জগৎ—নৈশ রহস্যাবলী দিয়ে তা ঘেরা। ঘন গভীর রঙ, কালো পটভূমি ও মৃদু আলোর আভাসে এই ছবির জগৎ আমাদের যেন সৃষ্টির আদিম যুগে পৌঁছে দেয়।

চিত্রলিপি [১]-এর দুটি ছবি দেখুন—আদিম পৃথিবীতে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে মানুষের আবির্ভাব। পেন্‌সিল ও কালো জল রঙের ব্যবহারে এ ছবি দুটি অ-সাধারণ বলে প্রতিভাত হয়। একটিতে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসের স্তূপ হিংস্র পশুর পিঠের উপর বাইবেল-কথিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্র তনু মানুষ, অপরটিতে 'অসীম শূন্যে একা। অবাক্‌চক্ষু দূর রহস্য দেখা' —সৃষ্টির উষাকালে নিঃসঙ্গ মানুষ। মনে হয় যেন কত দূরের সে জগৎ—আমাদের সভ্যতার পর্ব থেকে কত লক্ষ বৎসর পশ্চাদ্‌বর্তী। আঁকাবাঁকা জটিল রেখাজাল, অসমতল বন্ধুর পশ্চাৎপট, অমানিশা ভেদ করে আলোর আবির্ভাবের ক্ষীণ প্রয়াস—সবটা মিলিয়ে প্রাগৈতিহাসিক অতীতের ছবি। এ ছবিতে যে দৃষ্টি প্রকাশিত, সে শিল্পদৃষ্টি বস্তুর গভীরে বস্তুর সৃষ্টির যুগে উপনীত হয়েছে।

আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্যে এক রহস্যলোকের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্র-চিত্রলোকে। মনে হয় একটা অশেষ শক্তিশালী কল্পনাদৃষ্টি রেখা ও রঙের জালে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সকল প্রত্যক্ষের গভীরে গিয়ে পৌঁচেছে।

এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় পশুপাখীর ছবিগুলিতে। প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, স্বপ্ন-দেখা ভয়ঙ্কর প্রাণী আমাদের বর্তমান থেকে অপসারিত করে

নিয়ে যায় অতীত কালে। আদিম সৃষ্টির আদর্শে আঁকা এই ছবিগুলিতে প্রাণীজীবনের গভীরতর দিকের গূঢ় অনুভূতি শিল্পী আয়ত্ত করেছেন বলে মনে হয়। এ যেন কল্পলোকের অহেতুক সৃষ্টি। বাস্তবে মিল নেই, অথচ এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য ও ছন্দসুষমার অভাব নেই। এই জন্তুর দেহের চেহারার আড়ালে যে ভাবের চেহারা আছে, শিল্পী সেই চেহারাই রেখা-বন্দী করতে চেয়েছেন। ফলে এইসব জন্তুর প্রাকৃতিক অনুকৃতি শিল্পী করেন নি, নোতুন রূপে তাদের রচনা করেছেন। 'চিত্রলিপি [১]'-এর কয়েকটি ছবি ও 'Chitralipi 2'-এর ৪, ১১, ১৩ সংখ্যক ছবিগুলি এর পরিচয়স্থল।

যে-সব প্রাকৃতিক দৃশ্য শিল্পী এঁকেছেন, সেগুলি ধরা পড়েছে শিল্পীর দৃষ্টির বাতায়নে—বিশ্বসৃষ্টির ললিতকলা নয়, অসুন্দর প্রকৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুন্দর ও আর্টকে এক বলে মেনে নিতে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্র-নাথের আপত্তি ছিল, তাই অবচেতন মনের সমুদ্রতল থেকে উত্থিত অসুন্দরের মিছিলকে শিল্পী সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন। 'প্রান্তিক' ও 'রোগশয্যায়' কাব্যে এর সামান্যতম ইশারা পাই, এই সব ছবিতে তা স্পষ্ট-উচ্চারিত।

মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। 'চিত্রলিপি [১]', 'Chitralipi 2' অ্যাল্‌বামে ও 'সে', 'খাপছাড়া' গ্রন্থে নানা মুখ, মুখোশ ও মুখভঙ্গির দেখা পাই। মানবমনের নানা ভাব ও বিকার এই সব ছবিতে ধরা পড়েছে। কোনোটা হাসি-হাসি ভাব, কোনোটা রহস্যপূর্ণ, কোনোটায় শিশুর সারল্য, কোনোটা কুৎসিত বিকৃত মুখভঙ্গি, কোনোটাতে বক্র-কুটিল চাহনি, কোনোটায় নিষ্ঠুর অবিশ্বাসী চাহনি। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী যথার্থই বলেছেন, "এদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কত জানা লোকের মুখের ছায়া দেখতে পাই, হঠাৎ যেন বহুকালের বিস্মৃত মানুষের চেহারা ও চরিত্রগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এইসব মুখগুলির মধ্যে যেন তাদের সত্তার গভীর সংঘাত ফুটে বেরিয়েছে। তারা যেন মনোজগতের এক একটি নীহারিকা। যে-সব মানসিক গতি নিজের কাছেও অজানা, অথচ অবচেতন চিত্তলোকে যা কখনো ভেসে উঠছে, কখনো বা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেইসব কল্পনাপ্রবণ মনের রহস্যপূর্ণ বিশেষত্ব ছবির মুখের রেখাতে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। তারা আঙ্গিকের বাঁধাধরা নিয়ম মানে নি বলেই তাদের প্রকাশভঙ্গি এত জোরালো এবং গতি এত অবাধ।"—[বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

'Chitralipi 2'-এর ৭, ৮, ৯ সংখ্যক ছবিগুলি এর উদাহরণস্থল।

এই অ্যাল্‌বামের ১৪ সংখ্যক ছবিটি কবির নিজের মুখের স্টাডি। নানা দিক দিয়েই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবচেতন মনের বিশৃঙ্খল রূপের চিত্রকর যিনি তাঁর এই স্টাডিতে রঙের ব্যবহারে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখমণ্ডলের 'আউট-লাইনে' এক সংক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ রূপলোকের দেখা পাই। হল্‌দে, সবুজ, পাটকিলে রঙের প্রলেপে ও জটিল রেখাজাল আকীর্ণ পটভূমিতে অবরুদ্ধ রূপলোকের নিঃশব্দ সংগ্রাম মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছবির বাঁ-দিকের পটভূমিতে পাটকিলে রঙের ব্যবহারে অন্ধকারলোকের এবং ডানদিকে হলুদ রঙের গাঢ় উজ্জ্বল প্রলেপে আলোর আভাস পাই। আলোক ও অন্ধকারের বৈপরীত্যের মাঝে শিল্পীর স্বকৃত মুখমণ্ডলে যে প্রতিজ্ঞা, নয়নে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে খানিকটা বিষাদের ভাব ফুটে উঠেছে, তা গভীরভাবে দর্শক-চিত্তে মুদ্রিত হয়ে যায়।

আর তখনি রবীন্দ্রচিত্রলোকের দর্শক উপলব্ধি করে যে, সে এক মহান প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর জগতে এসেছে, সে ভালো-মন্দয় মেশানো, সুর-অসুরের দ্বন্দ্বে নিয়ত উত্তেজিত। চেতনলোকের অন্তরালে অবচেতন মনের সমুদ্রতলোত্থিত নানা ভাবনার রূপের মিছিল বিমুগ্ধ দর্শকের দৃষ্টিপথে দেখা দেয়। সে মিছিলের রূপকার রবীন্দ্রনাথ; তিনি অর্থহীন-ধ্বনিহীন রেখার জগতের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন,

"অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্র রূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে সৃজনে প্রলয়ে,
অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয় আঁধারে আঁধারে।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল চুপে চুপে অর্ধস্ফুট স্বপ্ন-মূর্তি-রূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্য-লোকে আনিয়াছি তোকে॥"

[পরিশেষ]

'ছিন্নপত্রাবলী'র রবীন্দ্রনাথ

'ছিন্নপত্র' বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই পত্রগুচ্ছ স্বাদবৈচিত্র্যে গদ্যসৌন্দর্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয়-প্রকাশে মূল্যবান।

'ছিন্নপত্রে'র আলোচনা যখন করেছি [দ্রষ্টব্য—বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্র-মনীষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আমিয়েলের জর্নাল' ও 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র' প্রবন্ধ], তখন অতৃপ্ত মনে এ'কথা ভেবেছি, পত্রলেখকের নির্মম সম্পাদনা থেকে 'ছিন্নপত্র'কে কি রক্ষা করা যেত না?

সে-আলোচনায় বলেছি, 'ছিন্নপত্রে'র প্রধান মূল্য এইখানে যে, তা রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এ'কথা রবীন্দ্রানুরাগীর অজানা নয়। শিল্পসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজঘর আছে, তার পট সরিয়ে ফেলে উৎস বা প্রাথমিক উপাদানের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহা। কাব্যের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়; জীবনচরিতে, বাইরের ঘটনায় কবিপরিচয়সন্ধান মূঢ়তা—এই ছিল তাঁর অভিমত। কবিজীবনে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তরুণ যৌবনের কবির জীবনের পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর্ব—সেটির কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চান নি। 'জীবনস্মৃতি' কবি রচনা করেছেন পঞ্চাশে উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কথা বলেই তিনি লেখনীর মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহদ্বারে পাঠককে পৌঁছে দিয়ে সরে গেছেন। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক যত বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় তাদের আপশোষ। 'কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, তাঁর ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন নি। বায়রণ বা গোটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কিছুই বলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে যা অনুদ্‌ঘাটিত, 'ছিন্নপত্রে' তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে

'ছিন্নপত্রে'র একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধ্যযৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেক কনফেশন শোনা যায়—যা আর কোথাও শোনা যায় না।' অবশ্য 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে অনেক কাটছাঁট করেছেন। আমার আক্ষেপ সেখানেই।

এতদিনে 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশে সে আক্ষেপ বহুল পরিমাণে মিটেছে। 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) 'ছিন্নপত্রাবলী' সংকলিত ও প্রকাশিত হলো। 'ছিন্নপত্রাবলী'র 'গ্রন্থপরিচয়ে' সম্পাদক বলেছেন—"১৮৮৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে যে চিঠিগুলি লেখেন তাহারই কতকগুলি (সংখ্যায় ১৪৫টি) ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে অংশতঃ সংকলিত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসর কয় মাসের প্রায় অধিকাংশ চিঠির সারাংশ দুটি বাঁধানো খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন; রবীন্দ্রনাথ বহু চিঠি পুরাপুরি আর বহু চিঠির বহু অংশ পুনশ্চ বর্জন করিয়া, প্রয়োজনমত ভাষা ও ভাব-গত সংস্কার করিয়া, সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া কতকটা 'সাহিত্যিক' আকার দেন—ইহাই ছিন্নপত্র সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ......ইন্দিরাদেবীর পূর্বোক্ত খাতা দুটিতে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি চিঠি মূলতঃ যে ভাবে পাওয়া যায় বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সম্পূর্ণ সংকলন। এজন্য ইহাতে ছিন্নপত্রে বর্জিত বহু চিঠি আছে (সংখ্যার হিসাবে ইন্দিরা-দেবীকে লেখা ১০৭টি অতিরিক্ত চিঠি আছে) আর বহু চিঠির বহু অংশ, পূর্বে যাহা বর্জিত ছিল, তাহাও সংকলন করা হইয়াছে।"

বর্তমান 'ছিন্নপত্রাবলী' সংকলনে পূর্বের ১৪৫টি পত্রের পূর্ণতর পাঠ ও নোতুন ১০৭টি পত্রের অসংক্ষেপিত পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়। স্বভাবতই আমাদের বক্তব্য এই নোতুন পত্রগুচ্ছ ও পূর্বের পত্রগুচ্ছের পূর্ণতর পাঠের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

॥ ২ ॥

ছিন্নপত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর আস্বাদ্যমানতা। বর্জিত অংশগুলির পুনর্যোজনায় উপভোগ্যতা বেড়েছে। আর নোতুন সংযোজিত পত্রগুলিতে

ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে আরো অন্তরঙ্গরূপে পাই। এই পরিচয় ছিন্নপত্রে ছিল, ছিন্নপত্রাবলীতে তা আরো গভীর ও অন্তরঙ্গ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পিতা রবীন্দ্রনাথ, পরিহাসরসিক রবীন্দ্রনাথ, বন্ধন-অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজদম্ভের প্রবল প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথকে এখানে অন্তরঙ্গ রূপে পাই।

বর্জিত অংশগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত কাছের মানুষরূপে পাই যে ভেবে বিস্মিত হই কেন তিনি এসব অংশ বাদ দিতে গেলেন। যেমন, 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২০৮ সংখ্যক পত্র—

পূর্বেকার অংশ—

> ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুবড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

বর্জিত অংশ—

> মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে—ইচ্ছে করে খানিকটে বরফ দিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।

এই পত্রের শেষে বর্জিত অংশ—

> ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পড়বার সব চেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ওসব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না—কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর নেই। ওসব বই আমি মফস্বলের জন্যে জমিয়ে রেখে দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের—এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। সত্য বলতে, আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে—তা, আছে বটে।

এই পত্রের বর্জিত অংশ দুটির কোনোটাই ত্যাগ করতে মন চায় না। দুটোর মধ্য দিয়ে কবিব্যক্তির ও পরিহাসরসিক মানুষের সুন্দর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই পরিহাসরসিক মানুষের একটি চমৎকার ছবি পাই নব-সংযোজিত ২১৯ সংখ্যক পত্রে। সাহাজাদপুর থেকে লেখা ৬ জুলাই ১৮৯১ তারিখের চিঠি। পুণ্যাহ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখছেন—

"......প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল—ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ শ্রেধা—সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে—সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি'। চাঁদমুখ একথায় বোধকরি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা—এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' ......শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল—কখনো কখনো এবা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে—বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম—এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"

এই পত্রের অন্তর্নিহিত পরিহাসরসিকতা এবং গভীর প্রজাবাৎসল্য ও দেশহিতৈষণা—দুই-ই সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। গ্রামের চাষীদের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা, বাৎসল্যভাব ও আত্মীয়বোধ 'ছিন্নপত্রাবলী'তে প্রকাশিত হয়েছে। [দ্রঃ ১১৬, ২১৯ সং পত্র]।

বিশুদ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদ ছিন্নপত্রাবলীর নবসংযোজিত পত্রগুচ্ছে পাই। ছিন্নপত্রে যা আভাসে ব্যক্ত, এখানে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। ২ সংখ্যক পত্রটি এর সুন্দর উদাহরণ। কবি বলছেন,

"কোমরটা যে কেবলমাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখার জায়গা তা আর কখনো মনে করব না—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। ......প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা

আর লিখব না। ভারী তো কোমর তার আবার কথা! একে তো aestheticsএর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাড়ে বছরে ক্রমিক উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বলি সেই হাসে, কারও করুণা আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হৃদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে বলতে—চাই নে কারও করুণা—

আমার কোমর আমারই কোমর,
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার কোমর আমারই আছে!

……কিন্তু থাক্, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হৃদয় আছে, তার আত্মা আছে—কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে—এবং খুবই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে!
চারি দিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে।"

এখানে পাঠকের স্মিতহাস্য ক্রমে উচ্চহাস্যে এবং উচ্চহাস্য ক্রমে অট্টহাস্যে পরিণত হয়।

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। যেমন, নবসংযোজিত ৫ সংখ্যক পত্রে সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বিবরণী। কবি বলেছেন,—

"এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড্ মাস্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন—'পড়্যা আমরা হেক্কা কুট্‌পাট্!' পরশুদিন সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল।"

এর পর ছাত্রদের ভাষণের আপাত গম্ভীর বিবরণ ও সভাপতিরূপে কবির ভাষণের সারাংশ। তারপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কবির বয়ানে এটি অপরূপ কৌতুকচিত্রে পরিণত হয়েছে।

"প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত, তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না—কবিত্বশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেন্‌ড্-মাস্টার উঠে বললেন—'পণ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ নন—স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখানে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হয় না—তিনি এঁর পিতামহ—রাজর্ষি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয় দেবেন্দ্র ঠাকুর এঁর পিতা।' তারপরে এল কবিত্বশক্তি এবং 'হেঁইলি নাটা'। আমি শুনে অপ্রস্তুত। তারপরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী—Example is better than precept—ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তারপরে সভা ভঙ্গ হল।"

আগাগোড়া উচ্ছ্বসিত কৌতুক, আপাত গাম্ভীর্যের নির্মোকে আবৃত, প্রতি মুহূর্তেই তা ফেটে পড়তে চাইছে। মজলিশী রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে পাই।

কিন্তু কেবল কৌতুক নয়, কঠিন প্রতিজ্ঞা, রুদ্ধ রোষ ও আহত দেশাভিমানের বেদনাও 'ছিন্নপত্রাবলী'তে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিক আত্মশক্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় এখানে পাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি পত্রের সংযোজিত অংশ। কটকে এক ডিনার টেবিলে এক উৎকট ইংরেজের দম্ভ ও অপমানসূচক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে পাই। যখন এই 'পূর্ণপরিণত জন্তুর' বললে যে এদেশের moral standard low, এরা জুরীপদের অযোগ্য, তখন কবির 'বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল'। এই উক্তির প্রতিক্রিয়ায় পত্রলেখকের মনের যে পরিচয় পাই, তা আজো বারবার স্মরণযোগ্য। কবি লিখছেন,

উঃ, ওদের কি গর্ব, কি অবজ্ঞা! আর আমাদের কি দৈন্য, কি হীনতা! ...আমি একসেপশন সাজতে চাইনি—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোন শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে আমি সন্ন্যাসি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুকরোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্য জাত যায়—যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়—তারপরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের ঝাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্ কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্য লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতর মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি—কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম,—আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব।

[ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ৭৯]

দেশপ্রেমের আগ্নেয় অক্ষরে লেখা এই পত্রাংশ রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন, এ'কথা ভেবে বিস্মিত হই। যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের বাণীসাধক, স্বদেশী

সংগীতের রচয়িতা, আত্মশক্তি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, সেই রবীন্দ্রনাথকেই আমরা নিতান্ত ঘরোয়া জীবনের মধ্যে পাই। এ কম সুখের কথা নয়।

কিন্তু 'ছিন্নপত্রাবলী'র গৌরব সেই ক্ষেত্রেই যে ক্ষেত্রে 'ছিন্নপত্রে'র গৌরব প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিমুগ্ধ কবিমানসের পরিচয় দুই সংকলনেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র নোতুন পত্রগুচ্ছে সে পরিচয় আরো মধুর, আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

নিঃসঙ্গ বোটবিহারী রবীন্দ্রনাথকে এই সব পত্ররচনাকালে সঙ্গ দিয়েছে চঞ্চলা সুন্দরী পদ্মা—সুখদুঃখভরা গ্রামমণ্ডল, নির্জন বালুচর, সুনীল আকাশ, রহস্যভরা মধ্যাহ্ন ও মোহিনী সন্ধ্যা। কবিমানসের যোগ্যধাত্রী পদ্মালালিত ভূখণ্ড আর নিঃসীম আকাশক্ষেত্র। এই পরিচয়ই কবির সত্য পরিচয়। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তা অপরূপ মাধুর্যে কোমলতার কারুণ্যে উদ্‌ঘাটিত।

এখানে যদৃচ্ছা কয়েকটি নোতুন চিঠির উদ্ধৃতি সংকলন করা যাক :

(ক) "এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালী আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে—তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্ত্যে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যেএকটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ঝাঁপ হাঁস্‌ফাঁস্ ধড়ফড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়।"

[সাজাদপুর থেকে লেখা ; ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ৬২]

(খ) "গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুরভুর

করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।……টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।……শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের তুলনাস্থল ছিল।"

[কর্মাটার থেকে লেখা ; ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১১২]

(গ) "স্টীমার যখন ইচ্ছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না—ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, যে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো বেজে উঠতে লাগল।"

[কলকাতা থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১০২]

(ঘ) "আমি চিঠি পাই সন্ধ্যের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে।"

[সাজাদপুর থেকে লেখা, ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১৪০]

এই যথেষ্ট। প্রকৃতি প্রেমের উত্তাপে ভরা এ-ধরণের চিঠি ছিন্নপত্রাবলীতে ছড়িয়ে আছে। কবিত্বপ্রধান প্রকৃতি-প্রেমমুগ্ধ উদাস ব্যাকুল একটি হৃদয়ের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রগুচ্ছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তিন প্রহরেই পদ্মালালিত ভূখণ্ড ও মেঘশূন্য নীলাকাশ কবির দৃষ্টিতে অপরূপ সৌন্দর্যের আকর বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে শান্তি, গভীরতা ও

রোমান্টিক ব্যাকুলতার রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে। সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি ও গল্পগুচ্ছের মানসপটভূমি এই পত্রলালিত নিসর্গ, এ'কথা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা হয় না।

'ছিন্নপত্রে'র শেষ চিঠির (১৫২ সংখ্যক) আদি রূপ 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২৪৬ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়। কেবল প্রকৃতিপ্রেমী কবিকে নয়, আলেখ্যকারকেও আমরা এই অপরূপ পত্রে পাই। দুটি পত্রই মূল্যবান। মূল চিঠিতে তন্দ্রালসা সন্ধ্যার আগমনের বর্ণনার সঙ্গে প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীলতা ও চলমান নবীনতার ইঙ্গিতটি রয়েছে। ছিন্নপত্রের অন্তর্গত সংস্কৃত পত্রে সেই ইঙ্গিত-বর্ণনাটি বর্জিত হয়েছে; কিন্তু সন্ধ্যার অভিসারিকা রূপটি ত্রুটিহীন নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। সবটা মিলিয়ে পড়লে কেবল মুগ্ধ হ'য়ে বলতে ইচ্ছা করে Here is God's plenty, কেবল স্বীকার করতে মন চায় রবীন্দ্রনাথ নামক প্রজাপতি-ব্রহ্মা তাঁর অর্ধমনস্ক পত্রেও আপন বিভূতি ও মহিমাকে গোপন করতে পারেন নি।

॥ ৪ ॥

'ছিন্নপত্রাবলী'র সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে কি কবি সচেতন ছিলেন না—এই প্রশ্নের আলোচনা এ'ড়িয়ে যাওয়া যায় না। পত্রসাহিত্য কবি-ব্রহ্মার অর্ধমনস্ক সাহিত্যসৃষ্টি, এ-কথা মেনে নিলেও এর মূল্য কমে না। ছিন্নপত্রের সংকলনকালে সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখক-রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর নির্মমভাবে কলম চালিয়েছিলেন। তার ফলে যেমন অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বেশ কিছুটা ঢাকা পড়েছে, তেমনি কবিহৃদয়ের অনেক কনফেশনও বাদ গেছে। সুখের বিষয় 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তা পুনঃসংযোজিত হয়েছে।

এই-সব পত্রে কবিমানসের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না—এই সত্য পত্রলেখকের অবিদিত ছিল না, তার প্রমাণস্থল 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬০ সংখ্যক (অংশতঃ সংযোজিত) ও ২০০ সংখ্যক (নোতুন) পত্রে। পত্ররচনায় কেবল লেখকের নয়, প্রাপকেরও একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। যেমন এই সত্য রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে এইসব চিঠির মূল্য যে কবিমানসের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটন, সে-কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে এই বক্তব্যের পোষকতা হবে। ১৬০-সংখ্যক পত্রের নবসংযোজিত অংশে ইন্দিরাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার একথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবল মাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।" [৭ অক্টোবর ১৮৯৪]

আর ২০০-সংখ্যক নবসংযোজিত পত্রে রবীন্দ্রনাথের গভীর আন্তরিক কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে—

"আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস [বব], আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব, তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকাভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি একরকম করে গাঁথা নেই।" [১১ মার্চ ১৮৯৫]

পত্রলেখকের সহযাত্রী হয়ে আমরা যখন 'ছিন্নপত্রাবলী'তে সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে পদ্মালালিত নির্জন চরভূমি, স্নেহময় তন্দ্রালস জনপদ এবং নিঃসীম নীলাকাশে মানস-পরিভ্রমণ করি, তখন রবীন্দ্রমানসের এক নোতুন পরিচয় আমাদের বিস্মিত দৃষ্টিপথে উদ্ঘাটিত হয়, প্রজাবৎসল স্বাজাত্যভিমানী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পরিহাসরসিক চিন্তাশীল বিদগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমী কবি-ব্যক্তিত্ব অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।